ইতিহাসের আলোকে দশাবতার

ড. ইন্দ্রজিৎ সরকার

ইতিহাসের আলোকে দশাবতার

ড. ইন্দ্রজিৎ সরকার

ITIHASER ALOKE DASHABATAR
by Dr. Indrajit Sarkar

প্রথম প্রকাশ : রথযাত্রা, ২০১৭

প্রকাশক
গীতিকা মাইতি
তুহিনা প্রকাশনী, ৩০/৬/২এ, মদন মিত্র লেন, কলকাতা - ৭০০০০৬
ফোন : ০৩৩ ২৩৬০ ৪৩০৬, ই-মেল : tuhinaprakashanikol@gmail.com

বর্ণ সংস্থাপন এবং মুদ্রণে
মহামায়া প্রেস এন্ড বাইন্ডিং, ২৩, মদন মিত্র লেন, কলকাতা - ৭০০০০৬
ফোন : ০৩৩ ২৩৬০ ৪৩০৬, ই-মেল : mahamayapress@gmail.com

প্রাপ্তিস্থান
তুহিনা প্রকাশনী, ১২সি, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০ ০৭৩
ফোন : ৯১৪৩০৩৭৮১৬

মূল্য : ২০.০০ টাকা

উৎসর্গ

পুণ্যশ্লোক পত্নীতাত
দিলীপ কুমার বসু'র
পবিত্র স্মৃতির উদ্দেশ্যে—

ভূমিকা

ইতিহাস শব্দের ব্যুৎপত্তি—ইতি - হ - আস ; এইরূপ ছিল। ইতিহাস মানব সমাজের বিবর্তনের পূর্ণাঙ্গ খতিয়ান; রাজকাহিনী নয়। তাই মানব সৃষ্ট সকল বিষয়েই তার অবস্থিতি—বিশেষতঃ শিল্পে ও সাহিত্যে। সেজন্য সাহিত্য ও শিল্পের মধ্যে নিহিত আছে মানব জাতির প্রকৃত ইতিহাস। আর ইতিহাসের অন্যান্য উপাদানগুলি শুধু তার সহায়ক মাত্র।

ভারতবর্ষ মানব সভ্যতার প্রসূতি। তার সুদীর্ঘ ইতিহাস বেদ-বেদান্ত-পুরাণ-রামায়ণ-মহাভারত প্রভৃতি সাহিত্যে এবং অগণিত স্থাপত্য - ভাস্কর্যে বিদ্যমান। কিন্তু আমরা চক্ষুষ্মান হয়েও অন্ধ। আমাদের নেত্রদুটি কেবল মুখমণ্ডলের শোভাবর্ধনের জন্য বিদ্যমান, নিরীক্ষণের জন্য নয়। তাই আমরা আপনার চক্ষে, আপনার সাহিত্য শিল্পকলার মধ্যে,আপনার দেশের ইতিহাস দেখতে পাই না। যদি সে চোখে বিদেশী-পরকলা লাগাই, তবে দেখতে পাই। কিন্তু সে দেখা স্পষ্ট নয়—ঝাপসা। আর সেই অস্পষ্ট ঝাপসা দেখা নিয়েই আমরা জ্ঞানের আতশবাজি ওড়াই। পাশ্চাত্য পণ্ডিতের পরকলায় দেশের ইতিহাস পড়তে গিয়ে সব যেন গুলিয়ে যায়। আজ ভারতবর্ষের ইতিহাস বলে যে বস্তুটি আমরা পড়ি সেটি অন্ধের হস্তীদর্শনের নামান্তর অজ্ঞতা ও অল্পজ্ঞতার রোশনাই মাত্র। বিদেশী পরকলাটি খুলে যদি একবার নিজের দেশের দিকে স্বচ্ছ দৃষ্টিতে তাকাই তবে ভারতবর্ষের প্রকৃত ইতিহাস দেখতে পাই। সে ইতিহাস কী? —প্রভেদের মধ্যে ঐক্যস্থাপন অর্থাৎ নানা পথকে একই লক্ষ্যের অভিমুখী করে তোলা এবং বহুর মধ্যে এক-কে নিঃসংশয়রূপে অন্তরতর রূপে উপলব্ধি করা। এই এক-কে প্রত্যক্ষ করা এবং ঐক্যবিস্তারের চেষ্টা করাই ভারতবর্ষের ইতিহাসের মূলসূত্র। এই ঐতিহাসিক সত্যটি বেদ-বেদান্ত পুরাণ-রামায়ণ-মহাভারতের মধ্য দিয়েই প্রকাশলাভ করেছে।

এমনই এক ঐক্য প্রচেষ্টা আমরা দেখতে পাই 'দশাবতার' কাহিনীতে। এই কাহিনীর মধ্যেই নিহিত আছে ভারতীয় রাষ্ট্রজীবনের চিরঐক্যের ক্রমবিকাশের ইতিহাস। দশাবতার ভারতীয় জাতিগঠন ও জাতীয়তাবাদ স্থাপনের অভিব্যক্তির ইতিহাস। দুর্বৃত্ত পীড়নে সমাজজীবন যখন বিপন্ন হয়ে পড়ে, দুর্জনরা প্রবল থেকে প্রবলতর হয়ে ওঠে, তখন সেই দুষ্কৃতিদের দণ্ড দিয়ে সমাজকে রক্ষা করতে অসামান্য অতিমানব নানারূপে অবির্ভূত হন তাঁরাই 'অবতার'। সমাজের পদদলিত মানুষের আত্মবিশ্বাস ও সামর্থ্য জাগিয়ে; অসীম কর্তব্যবোধ, বিশাল-চরিত্র,

নিরতিশয় জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ করে জাতির সামনে দৃষ্টান্তস্বরূপ পথ প্রদর্শন করাই অবতারের কাজ। দশাবতারের মধ্যে শ্রীরাম ও শ্রীকৃষ্ণ এই কাজটি সর্বাপেক্ষা সুচারুরূপে সম্পন্ন করেছিলেন বলে আজ তাঁরা মর্যাদা পুরুষোত্তম নামে পূজিত ও আপামর হিন্দুচিত্তে অবতার-বরিষ্ঠ রূপে প্রতিষ্ঠিত।

অবতার তত্ত্ব প্রথম শুনি, গীতায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণের মুখে—'পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্ / ধর্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে।' এই মহাবাণীতে। সাধুদের পরিত্রাণ ও দুষ্কৃতীদের বিনাশ এবং ধর্মসংস্থাপনের জন্য আমি যুগে যুগে ধরাধামে অবতীর্ণ হই। এটি অবতারবাদ, যা হিন্দুধর্মের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য। তাই আমাদের পুরাণ সাহিত্যে ও অন্যান্য প্রাচীন গ্রন্থে, কবিদের রচিত স্তবস্তুতিতে ভগবানের নানা অবতারের কথা বর্ণিত হয়েছে। তারমধ্যে মৎস্যাদি দশ অবতার প্রধান। আজও মানুষ এই দশাবতারকে নিত্য স্মরণ করে। হিন্দুদের প্রতিটি পূজা পার্বণে দশাবতারকে অবশ্যই প্রণাম করতে হয়। দশাবতারকে প্রণাম না করে কোনো দেবতার পূজা আরম্ভ করা যায় না। এই দশাবতারকে হিন্দু এত শ্রদ্ধা করে কেন? কারণ, দশাবতার ভারতীয় রাষ্ট্র ও জাতীয় জীবন তথা জাতীয়তাবাদের প্রতিষ্ঠাতা। দশাবতার কাহিনীর মধ্যে ভারত রাষ্ট্র তথা জাতীয় জীবনের ক্রমবিকাশের ইতিহাস সুপ্ত হয়ে রয়েছে। চিন্তার পরশপাথর ছোঁয়ালেই তা জেগে ওঠে। লক্ষ্য করার বিষয় গীতায় অবতার সৃষ্টির মূল কারণ বলা হয়েছে 'ধর্ম-সংস্থাপন'। ধর্ম কি? ধর্ম হ'ল যার সাহায্যে মানুষ ইহজীবনে সুখ সমৃদ্ধি লাভ ক'রে পশুত্ব থেকে মনুষ্যত্বে এবং মনুষ্যত্ব থেকে দেবত্বে উন্নীত হতে পারে। আর ধর্ম-সংস্থাপন ব্যাপারটি কি? মানুষ সামাজিক জীব। সে নির্ভয়ে সুখে-শান্তিতে বসবাসের জন্য অন্যদের সঙ্গে সুসম্পর্ক গড়ে তুলে সুশৃঙ্খল সমাজ সৃষ্টি করেছে। বিশৃঙ্খল সমাজে ব্যক্তিসত্তা বিকাশের প্রয়োজনীয় স্থিরতা ও সাহায্য পাওয়া যায় না। তাই সমাজ ও ব্যক্তির উন্নতি পরস্পর সাপেক্ষ। সমাজের উন্নতির অর্থ, প্রতিটি ব্যক্তির নিজ নিজ গুণ ও সামর্থ্য অনুসারে সুখ-সমৃদ্ধি লাভ। এই সুখ-সমৃদ্ধি লাভের উপায় সৃষ্টি করাই ধর্মস্থাপন। দশ অবতারের প্রতিটি অবতারে পরমেশ্বর এই 'ধর্ম সংস্থাপন' করেছেন বলেই আজও তাঁদের নিত্য স্মরণ করি।

'সংস্কৃতি হ'ল সমাজের আত্মা। ভারতীয় সংস্কৃতিতে কোন্-কোন্ গুণের প্রাধান্য এবং কোন্ কোন্ দোষ পরিত্যাজ্য তা এই দশাবতার জীবনচরিত আলোচনায় স্পষ্ট হ'য়ে ওঠে। পাশ্চাত্য ভোগবাদ আমাদের দেশে যে সংস্কৃতি ও সভ্যতার সঙ্কট সৃষ্টি করে চলেছে, দশাবতার কাহিনী তা থেকে আমাদের উদ্ধার করবে। কারণ, ভারতীয় সমাজ ও জাতীয় জীবনের চাবিকাঠি এই দশাবতারের জীবন কথায় নিহিত রয়েছে। ভারতের জাতীয় জীবনের বিকাশ ও তার স্বরূপ এবং বারংবার নানা প্রলয় সঙ্কট থেকে কেমনভাবে আমরা উদ্ধার লাভ করেছি তারই ইতিহাস এই দশাবতার চরিত। তাছাড়া এই কাহিনী সমূহে আমরা ভারতীয় জাতি (Nation)

গঠনের একটি সুস্পষ্ট ধারণা পাই। ইংরেজের 'শয়তানি ইস্কুলে' প'ড়ে আমরা যে ছিন্নমস্তা শিক্ষা লাভ করেছি, তাতে আমাদের বদ্ধমূল ধারণা হয়েছে যে ইংরাজ ভারতে আসার আগে আমাদের কোনো Nation ছিল না। তারাই আমাদের Nation গ'ড়ে দিয়েছে। দশাবতারের জীবনচরিত পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, ইংরেজের তৈরি এই তত্ত্বটি কত বড় এক মিথ্যার সুনিপুণ বেসাতি। ইংরাজি শিক্ষিত ভারতীয় তার জাতীয় সংস্কৃতিকে অস্বীকার করছে বলেই তার সামনে আদর্শহীন নিরাশাময় জীবন ব্যতীত আর কিছুই নেই। জাতীয় জীবনের উচ্চ আদর্শ সম্পর্কে অজ্ঞ থাকার ফলে সমাজ আজ স্বার্থলোলুপ, সামর্থ্যহীন, কলহপ্রিয়, প্রতিকার-অক্ষম হয়ে উঠেছে। অথচ আমরা লক্ষ্যই করিনি। সেই কোন আদিমকাল থেকে আমাদের জাতীয় জীবনের ধারা দশাবতার চরিতকথার রূপকের অন্তরালে কেমন অখণ্ড অপ্রতিহত গতিতে প্রবাহিত, যা বিনাশহীন, গৌরবময় ও বিশ্ববিজয়ী। দশাবতার কাহিনীর মধ্যে স্বাভিমানী, তেজস্বী, যশস্বী জীবনযাপন করার দুর্দমনীয় উৎসাহ অনায়াসেই পাই।

পুস্তিকাটি প্রকাশ করে তুহিনা প্রকাশনীর কর্ণধার শ্রী হিমাংশু মাইতি আমাকে কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ করেছেন। তাঁর প্রকাশনা সংস্থার শ্রীবৃদ্ধি কামনা করি। এই পুস্তিকা পাঠকের আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণ করলে আমার পরিশ্রম সার্থক।

শ্রীকৃষ্ণ কুঞ্জ
সাউথ রামনগর, বারুইপুর
২৪ পরগণা (দঃ); ৭৪৩৩৮৭

ড. ইন্দ্রজিৎ সরকার

মৎস্যাবতার ঃ ভারতীয় জাতিসত্তা

ভগবান বিষ্ণুর দশ অবতারের মধ্যে প্রথম অবতার 'মৎস্য'। কান্ত কবি জয়দেব তাঁর দশাবতার স্তোত্রে মৎস্যাবতার সম্বন্ধে বলেছেন—

' প্রলয়পয়োধি জলে ধৃতবানসি বেদং
বিহিত বহিত্রচরিত্র মখেদম্।
কেশবধৃতমীন শরীর, জয় জগদীশ হরে।'

অর্থাৎ, যে বেদে তোমার চরিত্র ভবসাগরের তরণীরূপে উপদিষ্ট হয়েছে, সেই বেদকে তুমি প্রলয়জলরাশি মধ্যে অনায়াসে ধারণ করেছিলে ; হে কেশব, হে মৎস্যরূপী, হে জগদীশ্বর হরি, তোমার জয় হোক।

ভারতীয় সংস্কৃতির ঊষাকালে যে সময়ে হিমালয় উপত্যকা ভূমির সঙ্গে দক্ষিণের সমভূমি সংযুক্ত হয়েছিল এবং দক্ষিণের নৈর্ঋত অঞ্চল জলমগ্ন হ'য়ে আফ্রিকার সঙ্গে ভারতের দক্ষিণ অঞ্চলের প্রাচীন সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়েছিল, সেই সময় দক্ষিণ সমুদ্র তীরে বসবাসকারী মানুষ উত্তর অঞ্চলে অনুপ্রবেশ করতে শুরু করে। এইসব মানুষ সাধারণভাবে অসংস্কৃত ছিল; এদের মধ্যে প্রায় একই রকমের মাৎস্যন্যায় প্রচলিত ছিল। মনে হয়, এই কারণে এরা মৎস্য নামে পরিচিত ছিল। কিম্বা তাদের গোষ্ঠীর কোনো নেতার নাম ছিল মৎস্য'। তাছাড়া এত স্বাভাবিক ও স্বচ্ছন্দে জলে চলাফেরা করতো যে, স্থলভাগের মানুষ এদের 'মৎস্য' বলতো। এই তত্ত্বের সমর্থনে আমরা মহারাষ্ট্রে লোককথায় (বখরী) ইংরাজ ও ফরাসীদের জলচর জাতি হিসেবে বর্ণনার কথা বলতে পারি। যাহোক 'মৎস্য' অর্থে যে মাছ (fish) বোঝানো হয়নি, একথা একটু চিন্তা করলেই বোঝা যায়। বরং বোঝা যায় যে 'মৎস্য' কোনো এক বিশেষ জলচর জাতির রহস্যময় নাম।

মহাত্মা মনু হিমালয়ের পশ্চিম দিকের ঢালু অঞ্চলে বসবাস করতেন। প্রচলিত লোক-কথা অনুযায়ী হিমাচল প্রদেশের মানালী অঞ্চলের এক গ্রামে তাঁর আশ্রম ছিল; যেখানে তাঁর স্মৃতিতে এখনও প্রতিবৎসর উৎসব হয়। বিপুল বিদ্যা ও তপস্যার জন্য লোকসমাজে মনুর অত্যন্ত সম্মান ও সমাদর ছিল। সমাজের সমস্ত শ্রেণীর মানুষের জন্য তাঁর হৃদয়ে ছিল অসীম দয়া ও অনন্ত সহানুভূতি। তাই শত্রুদের হাত থেকে বাঁচার জন্য মৎস্য (জলচর ব্যক্তি) তাঁর সামনে উপস্থিত হ'লে তিনি তাঁকে অভয় দিয়ে রক্ষা করেন।

এই মৎস্য জাতির মতো আরও বহু জাতি দক্ষিণদেশে বসবাস করতো। এইসব জাতির মধ্যে সদা-সর্বদা বিবাদ লেগে থাকতো। এই বিবাদের জন্য মৎস্য জাতি তিতিবিরক্ত হয়ে উত্তর ভারতে মনুর আশ্রমে আশ্রয়ের সন্ধানে আসে। সম্ভবতঃ আফ্রিকা থেকে বিচ্ছিন্ন হবার পর, বিশেষতঃ আফ্রিকার তট প্রদেশ সমুদ্রে বিলীন হওয়ার পর 'রাক্ষস' নামে অপর এক জাতি নিজ বাসভূমি নির্মাণের জন্য ভারতের দক্ষিণাঞ্চলের অন্যান্য জাতিদের পর্যুদস্ত করে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করতে সমর্থ হয়। এইসব পর্যুদস্ত-বিজিত জাতির মধ্যে 'মৎস্য' জাতির লোকেরা দলে দলে উত্তরভারতে মনুর আশ্রমে নিরাপদে বসবাস করতে শুরু করে। এই যে অল্পদিনে তাদের বিপুল বৃদ্ধি, পৌরাণিকদৃষ্টিতে তা মৎস্যের কলেবর বৃদ্ধিতে পরিণত হল। এই মৎস্য জাতির লোকেরাই মনুকে আসন্ন জল প্লাবনের কথা (সুনামি) অনেক আগেই বলে দিয়েছিল। কারণ, প্রকৃতির সঙ্গে তাদের সম্পর্ক ছিল অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। আমরা জানি, প্রাকৃতিক দুর্যোগের পূর্বাভাস পশুপক্ষীরা শিক্ষিত মানুষের চেয়ে অনেক আগেই পেয়ে থাকে। যাহোক, প্রলয়কালে কঠিন পরিশ্রম করে মানুষ সেদিন তার অস্তিত্ব রক্ষা করতে পেরেছিল। মৎস্যাবতারের কাহিনীর মধ্য দিয়ে এই সহজ সরল সত্যটিই প্রতিপাদিত হয়েছে।

মৎস্য জাতির লোকেরা উত্তরাঞ্চলে এসে দক্ষিণাঞ্চলে আর ফিরে যায়নি। তারা রাজস্থানের পূর্বাংশে এক সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করে। মহাভারতের যুগে যে রাজ্যের রাজা ছিলেন বিরাট। খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকের প্রথমভাগে (বুদ্ধের আবির্ভাবকালে) ভারতে ষোড়শ মহাজনপদের মধ্যে মৎস্য রাজ্যের উল্লেখ পাই।

আধুনিক জয়পুর রাজ্যের সীমানার মধ্যে আলোয়ার রাজ্যের সমগ্র ও ভরতপুর রাজ্যের কিয়দংশ নিয়ে এই রাজ্য গঠিত ছিল। রাজস্থানের এই অংশের দেশীয় রাজ্যগুলিকে সঙ্ঘবদ্ধ ক'রে 'মৎস্য-সঙ্ঘ' গড়ার আধুনিক প্রচেষ্টার কথা সকলেই জানি। সুতরাং 'মৎস্য' মাছ নয়, একটি জাতি। আর মৎস্য অবতার সেই জাতির পুরোধা পুরুষ; যিনি মহর্ষি মনুর সাহায্যে ভয়ঙ্কর জলপ্লাবন থেকে জাতিকে উদ্ধার করেন।

সেই প্রাচীনকালে মৎস্য ও রাক্ষসদের যে শত্রুতার সৃষ্টি হয়েছিল, রামাবতারের কাল পর্যন্ত সেই শত্রুতা চলতে থাকে এবং রাবণের মৃত্যুতে তার সমাপ্তি ঘটে। সেই সময়ে মৎস্যদের নাম ছিল বানর। বানর প্রধান হনুমান রাক্ষসদের উপদ্রবের স্থায়ী সমাধান কল্পে শক্তিশালী সংগঠন গ'ড়ে তোলে; যার সহায়তায় শ্রীরাম রাবণকে সংহার করেন। এই সংগঠনের সাহায্যে হনুমান প্রথমে 'সৌরমণ্ডল' নামক নিজ বাসভূমিকে রাক্ষসমুক্ত করার চেষ্টা করে ব্যর্থ হন। এই ঘটনাটির পৌরাণিক রূপ হ'ল, জন্মের পরেই হনুমান সৌরমণ্ডলে লাফিয়ে ওঠে এবং পড়ে গিয়ে হনু ভেঙে যায়। এই সৌরমণ্ডল দাক্ষিণাত্যের করমণ্ডল অঞ্চল; যার প্রাচীন নাম চৌলমণ্ডল'। এইভাবে মৎস্য নামের নানা পরিবর্তন হলেও এদের জলে চলাচল করার কৌশল কিংবা পরোপচিকীর্ষার গুণ লুপ্ত হয়নি। এদেরই নেতা হনুমান নৌকোযোগে

লঙ্কায় গিয়েছিল। নৌকা নোঙ্গর করা অর্থে সংস্কৃতে 'লাঙ্গল' কথা ব্যবহৃত হয়। এই লাঙ্গল হয়তো লিপিপ্রমাদ বা উচ্চারণ প্রমাদবশতঃ লাঙ্গুলে (লেজ) পরিণত হয়। এই মৎস্যদের উত্তরপুরুষ শিবাজীর 'মাত্তলী' জাতি। কারণ তাদের মাতৃভূমি এক, এবং পরোপকার, সহনশীলতা, চপলতা ও জলবিচরণ গুণাবলী এই মাত্তলী জাতির উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য।

শ্রীমদ্ভাগবতের অষ্টম স্কন্দের চব্বিশ অধ্যায়ের বর্ণনা থেকে মনে হয় মহর্ষি মনু উত্তরাঞ্চলে বসবাস করলেও তাঁর পরিবারের মূল ধারা দক্ষিণ ভারতেই ছিল। এখানে বলা হয়েছে, দ্রাবিড়েশ্বর সত্যব্রতের জন্য মৎস্যাবতারের সৃষ্টি। মৎস্যাবতার রাজা সত্যব্রতকে যা বলেছিলেন, তাই মৎস্য পুরাণ। সত্যব্রত পরবর্তীকল্পে মনু হ'য়ে জন্মেছিলেন। এই কাহিনী অনুসারে ধ'রে নেওয়া যায় যে, প্রলয়ের কিছু পূর্বে মনু দাক্ষিণাত্য ছেড়ে উত্তরাঞ্চলে চলে আসেন। মনুর মনে তাই দাক্ষিণাত্য প্রীতি থাকাই স্বাভাবিক আবার দীর্ঘদিন বসবাসের ফলে উত্তরের মানুষরা মনুর প্রতি শ্রদ্ধাশীল হ'য়ে ওঠেন। ফলে মনুর পক্ষে এদের নেতৃত্ব দিতে কোনো অসুবিধা হয়নি। রাক্ষসদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ মৎস্যদের মনুর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা তাই স্বাভাবিক মনে হয়। এরপর এরাই মহাপ্লাবনের সময় মনুর নেতৃত্বে নিজেদের এবং উত্তরাঞ্চলের লোকেদেরও রক্ষা করে। বিপন্ন মানুষকে সাহায্য করা একটি দৈবী গুণ, যা মৎস্যজাতির চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। এই ঘটনা পরবর্তীকালে পুরাণকারদের লেখনীতে মৎস্য অবতারের কাহিনীতে পরিণত হয়েছে।

ভারতের উত্তর ও দক্ষিণের মানুষের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় প্লাবন থেকে মানব জাতির উদ্ধার মনুর মনে নূতন ঊষার স্বর্ণদ্বার উন্মোচন করে। তিনি উপলব্ধি করেন ভারতীয় মাত্রেই আপনজন—উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব, পশ্চিম কোনো ভেদ নেই। সেদিন প্রথম জাতিসত্তা Nation দানা বাঁধল। এই ঘটনার মধ্য দিয়ে মনু সেদিন ভারতীয় সংস্কৃতির মূল বৈশিষ্ট্য উপলব্ধি করলেন। এর মধ্য দিয়েই ভারত ইতিহাসের এক অভিনব যুগ সূচিত হল। তিনি তাঁর এই গভীর উপলব্ধি মানুষের মধ্যে প্রচার করতে লাগলেন। তৈরী হ'ল 'Indian Nation'। পরবর্তীকালে মনুর প্রভাব এত গভীর হ'য়ে উঠল যে, যুগ বুঝাতে মন্বন্তর (মনু + অন্তর) কথাটি ব্যবহৃত হতে লাগল। এই মনু মানব ধর্মশাস্ত্র প্রণয়ন করলেন। মনুর সন্তান, অর্থাৎ মনু- প্রণীত সভ্যতা সংস্কৃতির ধারক বাহকগণই আজকের মানব। আজও আমরা কৃতজ্ঞচিত্তে নিত্য মনুর কথা স্মরণ করি। কারণ, তিনি মৎস্যাবতারের মাধ্যমে প্রথম 'Indian Nation' গঠন করেন; আজও যা ফল্গুধারার মতো ভারতীয় সমাজকে সজীব রেখেছে। এইসব ঘটনা বহুকাল যাবৎ ঘটেছিল। সুদীর্ঘ এই প্রগতির পথে যিনি নূতন দিগ্‌দর্শন করলেন, তিনি দ্বিতীয় অবতার কূর্ম।

কূর্মাবতার ঃ ভারতীয় জাতিগঠন

ভগবান বিষ্ণুর দ্বিতীয় অবতার কূর্ম। ইনি আপন পৃষ্ঠে মন্থন দণ্ডরূপ মন্দর পর্বত ধারণ করে দেবাসুরের সমুদ্রমন্থন নির্বিঘ্নে সম্পন্ন করেন। পুরাণসমূহে সমুদ্র মন্থন প্রসঙ্গে কূর্মাবতারের কথা পাওয়া যায়। সমুদ্র মন্থন একটি রূপক কাহিনী। মানব-হৃদয় সাগরের মতো বিশাল, গভীর ও নানা ভালো মন্দ মিশ্র ধারণায় পূর্ণ। এই ধারণাগুলিকে বিবেক বুদ্ধি দ্বারা মন্থন করার মধ্য দিয়েই সমাজ সৃষ্টির উপযুক্ত দৃষ্টি লাভ করা যায়। ফলে সমষ্টির পারস্পরিক সহযোগী কাজের মধ্য দিয়ে সমাজজীবনে স্থিতি আসে। এভাবেই মর্ত্যমানব মাৎস্যন্যায়ের হাত থেকে রক্ষা পায় এবং কীর্তিমান ব্যক্তি সমাজে অমরত্ব লাভ করে।

মৎস্যাবতারের কাহিনী বিশ্লেষণের সময় বলেছি, সে যুগে দাক্ষিণাত্যে নানাজাতির লোক বসবাস করতো; যাদের মধ্যে কোনো মৈত্রীভাব ছিল না। বরং সর্বদা সংঘর্ষ লেগেই থাকতো। সংস্কৃতির দিক থেকে এরা ছিল সমশ্রেণীভুক্ত। উত্তরাঞ্চলের মানুষ এদের চেয়ে অপেক্ষাকৃত সুসভ্য ছিল। এদের মধ্যেও দেব, যক্ষ, গন্ধর্ব, বিদ্যাধর, পিশাচ, ভূত, মানব, নানা প্রকারের মানুষ ছিল। সংস্কৃতির দিক থেকে এরাও ছিল সমশ্রেণীভুক্ত। এই সময় একটি প্রাকৃতিক দুর্যোগ ভারতের উত্তর ও দক্ষিণ অঞ্চলের ভৌগোলিক মিলন সাধন করল। উভয় অঞ্চলের মধ্যবর্তী সমুদ্র সরে গেল; আর দুই ভিন্ন সংস্কৃতির দেশ জুড়ে গিয়ে এক দেশে পরিণত হ'ল। এইভাবে ভিন্ন সংস্কৃতি ও ভিন্ন আঞ্চলিকতার দুটি মানবধারা এক দেশের অধিবাসী হয়ে গেল। এই সময় এদের পারস্পরিক সম্পর্ক যেমন গড়ে উঠতে লাগল, তেমন নিজেদের মধ্যে একটি ব্যবধানও এরা লক্ষ্য করল। ফলে নিজেদের মধ্যে একটি বিরোধ সম্ভবত সেই সময় দেখা দিয়েছিল; যা দেবাসুরের সংগ্রাম নামে পুরাণে বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু দুপক্ষেই বেশ কিছু মানুষ ছিল, যারা এই বিরোধ দূর করে মিলেমিশে থাকার পরিবেশ তৈরী করেছিল। সর্বোপরি ভৌগোলিক পরিবেশও সকলে মিলেমিশে থাকার অনুকূলেই ছিল। বিশাল দেশে সুখ সমৃদ্ধির সমস্ত উপাদানই ছিল। ফলে উভয় পক্ষের নেতৃস্থানীয় বেশ কিছু মানুষ দুই জনগোষ্ঠীর মধ্যে যাতে সুসম্পর্ক বজায় থাকে এবং সুখ-শান্তিতে সকলেই জীবনযাপন করতে পারে তারজন্য আন্তরিকভাবে মনপ্রাণ খুলে যে আলোচনা করেছিল, তারই পৌরাণিক সংস্করণ দেবাসুরের সমুদ্র-মন্থন, অর্থাৎ হৃদয় মন্থন।

এই আলোচনায় নেতৃত্ব দিতে এক সর্বজনমান্য নেতার প্রয়োজন দেখা দেয়—তিনিই বিষ্ণুর কূর্মাবতার। আলোচনার আরম্ভে দুই দলের বাদানুবাদ প্রবল হয়ে ওঠে। পুরাণকার এই অবস্থাকে মন্থনদণ্ড মন্দর পর্বতের সমুদ্রে বসে যাওয়ার ঘটনা হিসাবে বর্ণনা করেছেন। এই মহাসঙ্কট থেকে দেবাসুরকে উদ্ধার করলেন কূর্মাবতার আপন পৃষ্ঠে মন্থনদণ্ড ধারণ ক'রে অর্থাৎ আলোচনায় অধ্যক্ষতা শুরুর মাধ্যমে। মন্থন চলতে লাগলো—আলোচনা চলতে লাগলো। কূর্মাবতার অধ্যবসায়ী, আশাবাদী, বুদ্ধিমান—কচ্ছপের সকল গুণের অধিকারী। তিনি দৃঢ় নিরপেক্ষতায় অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে আপন কর্তব্য সুচারুরূপে সম্পন্ন করলেন। পরিণামে মানব সাগর মন্থন করে সমাজ অমৃত লাভ করল—পরস্পরের সহযোগে সকলের হিতচিন্তার সমন্বয় সেই অমৃত। তবে গরল কি? সমুদ্রমন্থনে তো গরলও উঠেছিল। গরল হল আলোচনার মধ্যে বিবাদের বিষাক্ত পরিবেশ সৃষ্টি। উভয়পক্ষের বিভিন্ন নেতা এই বিষাক্ত পরিবেশ তৈরি করেছিল যা থেকে কূর্মাবতার অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে তাদের উদ্ধার করেন এবং আলোচনা চালাতে থাকেন। আলোচনা চলাকালীন কূর্মাবতার বলেন, 'যার যা-কিছু নিজস্ব, তাই ভালো।' এটি স্বাভিমান সৃষ্টির প্রয়াস; মৎস্যাবতারে যে Nation গঠিত হয়েছিল, তাকে আরও মজবুত করার কৌশল। কূর্মাবতার অত্যন্ত যোগ্যতার সঙ্গে এই যে আলোচনা চালিয়ে গেলেন ; তাতে যথেষ্ট শুভফল লাভ হয়েছিল। এক সুস্থির সমাজ সৃষ্টি হয়েছিল, যার ফলে বেশ কিছু শক্তি অমৃততত্ত্ব লাভ করেছিল। সেই তত্ত্বটি হ'ল—সমাজ এক পুরুষ, আমরা তার অবয়ব; সমাজের কল্যাণে আমাদের কল্যাণ। এই ধারণার বশবর্তী হয়ে বহু মানুষ সমাজের উন্নতিতে আত্মনিয়োগ করলো। যার বুদ্ধি ও কৌশলে এই পরিবর্তন সম্ভব হয়েছিল তিনিই কূর্মাবতার—ভগবান বিষ্ণু। তিনিই এমন অমৃত দিশায় মানুষকে উত্তীর্ণ করেছিলেন। তাই আজও মানুষ তাঁকে সশ্রদ্ধ চিত্তে স্মরণ করে। অন্তরের শ্রদ্ধা ভালবাসায় ভগবানের আসনে প্রতিষ্ঠা করে।

পুরাণকারগণ বলেন, সমুদ্র মন্থনের ফলে কামধেনু (কৃষিজমি), উচ্চৈঃশ্রবা ঐরাবত (শক্তি ও তেজ), কৌস্তুভ মণি (সম্পদ), ঔষধিপতি চন্দ্র (বৈদ্য), লক্ষ্মী (শ্রী), অপ্সরা পারিজাতবৃক্ষ (সৌন্দর্য) ইত্যাদি বহু সম্পদ ওঠে। এগুলি উভয়পক্ষে ভাগ ক'রে নিয়েছিল আপোষের মাধ্যমে। ফলে উভয়পক্ষের বন্ধুত্বপূর্ণ মানসিকতা প্রকাশ পায়। মন্দবুদ্ধি রাক্ষসরা কিন্তু সেই মানসিকতা অনুযায়ী কাজ করতে পারলো না। ব্যক্তি স্বার্থ ও ভোগময় প্রবৃত্তির কবলে পড়ল। অপর দিকে দেবতারা কিন্তু ব্যক্তি স্বার্থ সংযত ক'রে সমুদ্র মন্থনের ফলে যে সমন্বয়-অমৃত উঠলো তা লাভ করল। অর্থাৎ দেবতারা বুঝলো সমন্বয়ের মধ্য দিয়েই উন্নতি সুখ সমৃদ্ধি শান্তি সবকিছুই পাওয়া যায়। তারা সেভাবেই তাদের জীবনচর্যা গ'ড়ে তুলল; অমৃতলাভ করল।

রাক্ষসদের অধিকাংশ স্থূলবুদ্ধি হলেও রাহু ও কেতু পারস্পরিক সহযোগিতাও সমন্বয়ের মূল্য বুঝেছিল। তাই তারা যুক্তভাবে দাক্ষিণাত্যে আধিপত্য বিস্তারের চেষ্টা করে। কিন্তু সৌরমণ্ডল (করমণ্ডল) ও চন্দ্রমণ্ডলের (মালাবার অঞ্চল) মানুষদের সহায়তায় ভেদনীতির প্রয়োগে দেবতারা সেই চেষ্টা ব্যর্থ করেন। তবুও ঐ অঞ্চলে রাক্ষস-জাতির প্রাধান্য আজও বিদ্যমান। মন্দবুদ্ধিবশতঃ সমুদ্রমন্থনের পর (হৃদয় মন্থনের পর) দেবতাদের তুলনায় পিছিয়ে পড়া রাক্ষসরা শুক্রাচার্যকে গুরু করে এই পশ্চাৎগামী অবস্থা অনেকটা কাটিয়ে ওঠে। শুক্রাচার্য উত্তরাঞ্চলবাসী ব্রাহ্মণ — বুদ্ধিমান, রাজনীতিবিদ। তিনি সেযুগের পরিস্থিতি বুঝে রাক্ষসদের উপদেশ দেন— 'ঐক্যবদ্ধ হয়ে চেষ্টা করলে অতীতের চেয়ে বেশি বৈভবময় ভবিষ্যৎ গড়ে তুলতে পারবে।' এই আত্মবিশ্বাসী আশাবাদ শুক্রাচার্যের নিজস্ব 'সঞ্জীবনী বিদ্যা'।

সমুদ্র মন্থন প্রসঙ্গে মন্দর পর্বতের উল্লেখ আছে। এই মন্দর পর্বত বিহারের ভাগলপুরে অবস্থিত। মনে হয়,এই পর্বতের আশেপাশে কোথাও এই গুরুত্বপূর্ণ অলোচনা অনুষ্ঠিত হয়েছিল; যার অধ্যক্ষ ছিলেন কূর্মাবতার। এই ধারণার পক্ষে আর একটি যুক্তি হ'ল এখানে কূর্মী জনগোষ্ঠীর আধিক্য। কূর্মাবতারের আবির্ভাব হয়তো এই কূর্মী কুলেই হয়েছিল। কিম্বা কূর্মাবতারের উত্তর পুরুষরা কূর্মী নামেই পরিচিত হয়েছিল। এই জনগোষ্ঠী উত্তর ভারতের নানাস্থানে থাকলেও বিহারেই বেশি দেখা যায়।

সমুদ্র মন্থনের বর্ণনা রোমহর্ষক অদ্ভুতরসের বিষয় হলেও এটি মূলতঃ ভারতীয় রাষ্ট্রজীবনের এক মহৎ প্রগতি-পুঙ্খের (Point) কাব্যময় সত্যকথা। কোনো সমাজ যদি সংহত জীবনযাপনের বাইরে চলে যাওয়ার অবস্থায় পৌঁছায় তবে সে সমাজে অন্ত র্বিরোধ দেখা দেয়। অধুনা পাশ্চাত্যে এইরকম পারস্পরিক দ্বন্দ্ব দেখা যাচ্ছে। কিন্তু সকলের হিতের দিকে লক্ষ্য রেখে পারস্পরিক সহযোগিতার ভাব বৃদ্ধি করার মধ্য দিয়েই স্বার্থ দ্বন্দ্বের মীমাংসা করার মতো ব্যক্তি পাশ্চাত্য দুনিয়ায় আছেন। তাই সেই অন্তর্বিরোধ প্রবল রূপ ধারণ করছে না। যদিও মার্কসবাদীরা সেই দ্বন্দ্বের ধিকি-ধিকি আগুনে অহরহ ইন্ধন দিয়ে চলেছে।

সমুদ্র মন্থনের কাহিনীর মধ্য দিয়ে ভারতীয়রা যে অমৃততত্ত্ব প্রাচীন সভ্যতা ও জাতীয় জীবনের ঊষাকালেই উপলব্ধি করেছিল তার জন্য কূর্মাবতারের অবদান অনস্বীকার্য। তিনিই উত্তর ও দক্ষিণ ভারতের মধ্যে সৃষ্ট বিভেদের অপনোদন করার জন্য ভারতীয়দের হৃদয়মন্থন রূপ আলাপ-আলোচনা ও বিচারের ব্যবস্থা করেন; যা পুরাণকারদের রচনায় সমুদ্র-মন্থনের রূপ লাভ করেছে। কূর্মাবতারের মূল শিক্ষা হল পারস্পরিক সহযোগিতা ও সমন্বয়ের মাধ্যমেই সমাজে সুখ শান্তি বিরাজ করে এবং সমস্ত বিবাদের সমাধান আলোচনার মাধ্যমেই করা যায়।

বরাহ অবতার ঃ বিদেশী আক্রমণ প্রতিহত

' বসতি দশনশিখরে ধরণী তব লগ্না
শশিনি কলঙ্ক কলেব নিমগ্না।
কেশব ধৃত শূকররূপ, জয় জগদীশ হরে।।'

ভগবান বিষ্ণুর তৃতীয় অবতার বরাহ। ইনি আপন দন্তাগ্রে বসুধাকে ধারণ করে রক্ষা করেছিলেন। বরাহ অবতারের কথা বলতে গেলে সেই সময়ের সামাজিক-রাজনৈতিক অবস্থার কথা বলা প্রয়োজন। ভারতে যখন— একটি Nation গঠিত হয়েছে, ধীরে ধীরে সেই Nation শক্তিশালী হচ্ছে, ভারতের বৈভবের কথা বিশ্বে প্রচারিত হচ্ছে; ভারতের সভ্যতা সংস্কৃতি সকলের ঈর্ষার বস্তু হয়ে উঠছে। তখন বহিঃশত্রুর আক্রমণ শুরু হ'ল। ভারতবর্ষে প্রথম বিদেশী লুণ্ঠনকারী দৈত্য হিরণ্যাক্ষ। ভারতের ঐশ্বর্যের (হিরণ্য) দিকে সর্বপ্রথম তার দৃষ্টি (অক্ষ) পড়ায়, বোধ হয় তার এরকম নামকরণ হয়েছিল। হিরণ্যাক্ষ ক্রূরকর্মা ও পরাক্রমশালী ছিল। অগ্নি সংযোগ, লুণ্ঠন, হত্যা এসব তার নিত্যকর্ম ছিল। তার অত্যাচারে পাঞ্জাব অঞ্চল জনবিরল হয়ে গেল। এই অবস্থার বর্ণনা করতে গিয়ে পুরাণকাররা বললেন যে, পৃথিবী যেন ক্রমে ডুবে যাচ্ছিল। সমাজ কথার অর্থ পৃথিবী, ভূমি, দেশ যাই বলা হোক না কেন, এতে রাষ্ট্রীয় চেতনার দৃঢ়তাই ফুটে উঠেছে। এই হিরণ্যাক্ষরূপী ঘোর সংকট থেকে যিনি সে সময় দেশকে রক্ষা করেন, তিনিই বিষ্ণুর বরাহ অবতার।

এই বরাহ অবতার প্রথম ভাড়াটে সৈন্য ব্যবস্থা (Mercenary army) প্রচলন করেন। পরে সেইসব ভাড়াটে সৈন্যের সাহায্যে হিরণ্যাক্ষকে পর্যুদস্ত ক'রে তার অত্যাচার থেকে দেশকে উদ্ধার করেন। ভাড়াটে-সৈন্যের মধ্যে বরাহের সমস্ত গুণ বর্তমান। তারা ক্রুদ্ধ বরাহ অপেক্ষা বেশি পরাক্রমী। আবার বরাহের মতো অপরিচ্ছন্ন। অর্থাৎ ন্যায়-নীতি ঔচিত্যবোধের ধার ধারে না। এরা সবসময় হুকুম তামিল করতেই অভ্যস্ত। এই রকম উপযুক্ত সৈন্যবাহিনীর সাহায্যে যিনি বিদেশী আক্রমণ কারীকে সংহার করেছিলেন, সেই লোকোত্তর পুরুষকে অবতার বলে গণ্য করাই তো স্বাভাবিক। এই অদ্ভুত সূক্ষ্মবোধ ও কর্মকুশলতার সাহায্যে যিনি বিদেশী আক্রমণ প্রতিহত করেছিলেন, তাঁর কীর্তিকলাপ অমর করে রাখার জন্য পুরাণকারগণ বরাহ-মুনির কথা প্রতিষ্ঠা করেন। বরাহ যেসব স্থানে যুদ্ধ ক'রে হিরণ্যাক্ষকে পর্যুদস্ত এবং পরে

হত্যা করেছিল সেইসব স্থান বরাহমুনির পীঠ 'বরাহমূলম্' স্থাপিত হয়; যার একটির নাম প্রাকৃতজনের ভাষায় এখনও 'বারমুলা'। বরাহ অবতারের দাঁতের উপর জলমগ্ন পৃথিবী-গোলকের চিত্র এই কাহিনীর সত্যতা প্রমাণ করে।

বৈদিক বর্ণনায় বরাহ অবতার যেভাবে দেখি, পুরাণে সেভাবে দেখতে পাই না। তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ, আরণ্যক ও শতপথ ব্রাহ্মণ অনুসারে প্রজাপতি ব্রহ্মা বরাহরূপ ধারণ ক'রে জলমগ্ন পৃথিবীকে জল থেকে তুলে উদ্ধার করেন। কিন্তু পুরাণে বিষ্ণুর বরাহরূপ ধারণের কথা বলা হয়েছে। 'হরিবংশ' অনুসারে ভগবান বিষ্ণু দুইবার বরাহ রূপ ধারণ করেছিলেন — প্রথমবার পৃথিবীকে জলতল থেকে রক্ষা করার জন্য আর দ্বিতীয়বার হিরণ্যাক্ষকে বধ করার জন্য। কালিকা পুরাণে বরাহ অবতারের বিস্তারিত বর্ণনা পাওয়া যায়। সেখানে বলা হয়েছে, এক বরাহ পৃথিবীকে ধর্ষণ করার পর যে সন্তান সন্ততি জন্মায় তারা মন্দস্বভাব হওয়ায় মহাদেব সেই বরাহকে বধ করেন। এই বরাহের ভিন্ন-ভিন্ন অবয়ব থেকে সকল জন্তুর উৎপত্তি। এই বর্ণনার তাৎপর্য হ'ল, ভাড়াটে সৈন্যরা হিরণ্যাক্ষ নিধনের পর শাসন ভার নিজেদের হাতে নিয়ে ভোগময় উৎশৃঙ্খল জীবনযাপনে ব্যস্ত হয়ে পড়লে চিন্তাশীল ব্যক্তিরা তীব্র তিরস্কার ক'রে তাদের কর্তব্যের দিশা দেখান। ফলে আবার নিজ নিজ যোগ্যতা অনুসারে যুগোপযোগী জীবনযাপন আরম্ভ হয়। কর্ণেল টড রচিত 'রাজস্থান' গ্রন্থের 'জয়সলমীর' পরিচ্ছেদে বলা হয়েছে যে, অতি প্রাচীনকাল থেকে সিন্ধু বালুচিস্তানে 'বরাহ' নামে এক রাজপুত জাতি ছিল। রাজস্থানের জয়সলমীরের ভূট্টি ঘরানার মধ্যে এদের বিবাহ সম্বন্ধ প্রচলিত ছিল। এই সব লোক বর্তমানে ধর্মভ্রষ্ট হয়ে মুসলমান হয়েছে। বাবরের 'আত্ম-চরিত' গ্রন্থেও এই বরাহ জাতির কথা পাওয়া যায়। মনে হয়, বরাহ অবতার নামে যে ব্যক্তি পুরাণে খ্যাত হয়েছিলেন, তারই বংশধর অথবা অনুগামী সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় এদেরও 'বরাহ' নাম হয়েছিল। সুতরাং 'বরাহ' বলতে এখানে কোনো জন্তুকে বোঝানো হয়নি, জন্তুর গুণযুক্ত কোনো মানব সম্প্রদায়কেই বোঝানো হয়েছে; যেমন 'মৎস্য' বা 'কূর্ম' ছিল মানবগোষ্ঠী।

এইভাবে যদি বিশ্লেষণ করা যায় তবে পুরাণের কল্পকথার ঐতিহাসিক ব্যাখ্যা পাওয়া সম্ভব। এই ভাবে মৎস্য, কূর্ম ও বরাহ এই তিন অবতারের কথা বিচার করলে দেখা যাবে, জাতি গঠনের ক্ষেত্রে প্রধান দুটি অঙ্গের অর্থাৎ দেশ ও জনগণের প্রাসঙ্গিক বিকাশ ভারতবর্ষে কেমনভাবে ঘটেছে। আর যেসব পুরাণকার ঋষি এই ঘটনাগুলিকে রূপকের মোড়কে পরিবেশন করেছেন, ধন্য তাঁদের প্রতিভা! কারণ রূপকের নির্মোক না থাকলে এইসব কাহিনী হাজার হাজার বছর ধ'রে অপরিবর্তনীয় রূপে অস্তিত্ব বজায় রাখতে পারতো না।

মৎস্য অবতারে যে ভূখণ্ড ও জাতি গঠিত হ'ল, কূর্ম অবতারে যে জাতি ন্যায় নীতিগত বৈশিষ্ট্য লাভ করে স্বাতন্ত্র্য সৃষ্টি করল। বরাহ অবতারে সেই জাতির জাতীয়তাবোধ আরও দৃঢ়ভাবে ফুটে উঠল। সেই জাতি বৈদেশিক শত্রুকে, বিদেশী লুণ্ঠনকারীকে Mercenary

Army গঠন ক'রে পর্যুদস্ত করল। এইভাবে একটি দেশ একটি জাতি, আপন বৈশিষ্ট্যে গড়ে উঠতে লাগল। সৃষ্টি হ'ল রাষ্ট্র ধারণা। একটি রাষ্ট্র গঠনের প্রাথমিক শর্ত হ'ল একটি নির্দিষ্ট ভূখণ্ড ও একটি জনগোষ্ঠী বা জনসমাজ। মৎস্য অবতার ভারত রাষ্ট্রের ভূখণ্ড নির্ধারণ ক'রে দিয়েছে, জাতি বা Nation এর বীজ বপন করে দিয়েছে। কূর্ম অবতার ন্যায়-নীতি নির্ধারণ ক'রে সেই Nation কে আরও দৃঢ়, বলিষ্ঠ ও ঐক্যবদ্ধ করেছে। আর বরাহ অবতার সেই ঐক্যবদ্ধ দৃঢ় বলিষ্ঠ জনসমাজ থেকে Mercenary Army তৈরী ক'রে হিরণ্যাক্ষের মতো বিদেশী লুণ্ঠনকারীর হাত থেকে ভারত ভূমিকে রক্ষা করেছেন। বরাহ অবতারের কালে আমাদের স্বাজাত্যবোধ, স্বাভিমান অনেক বেশি দৃঢ় হয়েছে, হিরণ্যাক্ষ বধের মধ্যে দিয়ে ভারতীয়দের মনে অন্যায় অধর্মের রাজত্ব উৎখাত ক'রে ন্যায় ও ধর্মরাজ্য স্থাপনের আকাঙ্ক্ষাই প্রস্ফুটিত হয়েছে এই ধর্মরাজ্য স্থাপনের অভীপ্সাই একটি জাতির মানসিক উন্নতির পরিমাপক। আজ থেকে হাজার হাজার বছর আগে ভারতীয়রা সেই উন্নত মানসিকতার উজ্জ্বল পরিচয় দিয়ে গেছেন; বরাহ অবতারের কাহিনীতে তারই প্রতিফলন, তারই এক কাব্যসুষমাময় অনবদ্য প্রকাশ।

নৃসিংহ অবতার ঃ বিজিত-বিজেতার সংঘর্ষ

ভগবান বিষ্ণুর চতুর্থ অবতার নৃসিংহ। কান্তকবি জয়দেবের ভাষায় তাঁর কীর্তিকলাপ এইভাবে বর্ণিত হয়েছে—

'তবকরকমলবরে নখমদ্ভুত শৃঙ্গম্!
দলিত হিরণ্যকশিপুতনুভৃঙ্গম।
কেশব ধৃত নরহরিরূপ, জয় জগদীশ হরে।।'

ইনি আপন সুতীক্ষ্ণ নখরে হিরণ্যকশিপুর দেহ ছিন্ন ভিন্ন করে তাকে হত্যা করেছিলেন। হিরণ্যকশিপুর এই পরিণতির নেপথ্য কাহিনীটি জানতে পারলেই পুরাণকারদের রূপকাশ্রিত কাহিনীর মর্মোদ্ধার করা সম্ভব হবে।

হিরণ্যকশিপু ভারতে রাজত্ব স্থাপনকারী প্রথম বিদেশী শাসক। তার দাদা হিরণ্যাক্ষ প্রথম বিদেশী লুন্ঠনকারী। তিনি রাজত্ব স্থাপনের চেয়ে লুঠতরাজ অত্যাচার, দমন পীড়ন ইত্যাদিতে অধিক মনোনিবেশ করেন। কিন্তু হিরণ্যকশিপু ভারতে স্থায়ী সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠায় আত্মনিয়োগ করেন। ইনি দৈত্য বংশজাত। আপন অনুগামী সহ তিনি খাইবার গিরিপথ দিয়ে ভারতে প্রবেশ করেন। বায়ব্যসীমার অর্থাৎ উত্তর পশ্চিম দিকের পাশের প্রদেশ জয় করে তিনি মুলতানে রাজধানী স্থাপন করেন। মনে রাখতে হ'বে বায়ব্যসীমা অর্থাৎ বায়ুকোণ। মুলতানের প্রাচীন নাম 'প্রহ্লাদপুরী'। সেখানে প্রহ্লাদের একটি মন্দিরও আছে। তপস্যার ফলে হিরণ্যকশিপু বরলাভ করেছিলেন যে, না-মানুষ, না-পশু এমন প্রাণীর হাতে না-দিন, না-রাত্রি এমন সময়ে, না-ঘরে না বাইরে এমন স্থানেই কেবল তাঁর মৃত্যু হতে পারবে। শুধু তাই নয়; আরও সাবধানতা অবলম্বন ক'রে তিনি বর চাইলেন, কোনো অস্ত্রশস্ত্রেও তাঁর মৃত্যু হবে না। পুরাণকারের এই বর্ণনার মধ্য দিয়ে হিরণ্যকশিপু কী নিপুণ দক্ষতায় তার শারীরিক নিরাপত্তার ব্যবস্থা করেছিলেন তা সহজেই বোঝা যায়। কিন্তু এত কঠোর নিরাপত্তার কী প্রয়োজন ছিল? কারণ তিনি বিদেশী এবং ভারতীয়দের উপর অকথ্য অত্যাচার চালাতেন। তিনি যে কী নিষ্ঠুর ছিলেন, পুত্র প্রহ্লাদের উপর অত্যাচারের বহর দেখে তা বোঝা যায়। মুষ্টিমেয় লোক অসংখ্য লোকের উপর আধিপত্য চালাতে গেলে অত্যাচারের মাধ্যমেই তা করতে হয়। আজও একথা জঙ্গীদের ক্ষেত্রে সত্য। তবে মুষ্টিমেয় অসভ্য বিদেশী লক্ষ লক্ষ সুসভ্য লোকের উপর শাসন চালাতে থাকলে, ধীরে

ধীরে সুসভ্য জাতির প্রভাব শাসকদের মধ্যেও পড়ে। প্রহ্লাদের উপর এমন প্রভাব পড়েছিল। তিনি ভারতীয় আদর্শের, সভ্যতা-সংস্কৃতির অনুগত হয়ে গিয়েছিলেন। হিরণ্যকশিপু কিন্তু পুত্রের এই আচরণ মেনে নেননি। তাঁর ভয় ছিল যে, তাঁর মৃত্যুর পর ভারতীয়রা প্রহ্লাদের মাথায় চড়ে বসবে আর রাজ্যপাট লাটে তুলে দেবে। তাই তিনি প্রহ্লাদকে দানবীয় ঘরানায় মানুষ করতে চেয়েছিলেন; যাতে প্রহ্লাদ তার মতো অত্যাচারী হয়। কিন্তু প্রহ্লাদ এই শিক্ষা কিছুতেই গ্রহণ করেনি। ফলে প্রহ্লাদকে হিরণ্যকশিপুর অকথ্য অত্যাচার সহ্য করতে হয়। এখন প্রশ্ন, প্রহ্লাদের উপর ভারতীয় সংস্কৃতির প্রভাব কিভাবে পড়ল? নাকি, এ ঘটনাটা কেবল ব্যতিক্রম। হিরণ্যকশিপুর পত্নী কয়াধু গর্ভবতী অবস্থায় নারদের আশ্রমে ছিলেন। সেখানে নিয়ত নারদের মুখে ভজন শুনতেন, নীতিকথা ও প্রবচন শুনতেন। এ সবের প্রভাব প্রহ্লাদ ও কয়াধু উভয়ের উপর পড়েছিল। প্রহ্লাদের মনে, এ দেশের মানুষের প্রতি প্রীতিভাব জাগলেও, প্রজাদের পক্ষ নিয়ে পিতার বিরুদ্ধে সরাসরি বিদ্রোহ করা তার পক্ষে সম্ভব ছিল না। কিন্তু তিনি এই সিদ্ধান্ত করলেন যে, বিষ্ণুভক্তিতে আপ্লুত হবেন। যত প্রতিকূলতাই আসুক না কেন, ভক্তিমার্গ ত্যাগ করবেন না। কারণ তিনি বুঝেছিলেন, বিষ্ণু এদেশের জনসাধারণ ও সভ্যতা সংস্কৃতির প্রতীক। যথারীতি প্রহ্লাদ অত্যাচারিত হতে লাগলেন এবং বিষ্ণুনাম স্মরণ ও কীর্তন করতে লাগলেন। জনসাধারণ তখন প্রহ্লাদের পক্ষে হিরণ্যকশিপুর বিরুদ্ধে সংগঠিত হতে শুরু করলো। তারপর জনসাধারণের সহ্যের সীমার অতিক্রম করলে জনশক্তি ভীষণ মূর্তিতে আত্মপ্রকাশ করল। পুরাণে বর্ণিত যে স্তম্ভের মধ্য থেকে নৃসিংহ অবতার বেরিয়ে এসেছিলেন, সেই স্তম্ভটি ছিল ক্রুদ্ধ জনশক্তির প্রতীক। তার উপর পদাঘাত করার পর সচকিতে যে ভীষণরূপ ধারণ করল। সেই ভয়ঙ্কর রূপই পুরাণকারের বর্ণনায় নৃসিংহ -অবতার, এই বর্ণনা যে রূপকাশ্রিত তাতে কোনো সন্দেহ নেই। এই অবতারের মধ্যে নৃ (নর) আর সিংহের অস্বাভাবিক মিশ্রণ রয়েছে। সত্যবৃত্তিতে জেগে ওঠা চেতনা ও প্রাণ হাতে নিয়ে মানুষের প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব—এই দুই রূপ মিলে এই অবতারের সৃষ্টি। প্রহ্লাদের উপর অত্যাচারের প্রতিকার চাইতেই ক্রুদ্ধ জনতা হিরণ্যকশিপুকে হত্যা করে। প্রহ্লাদের প্রতি বিশ্বাস ছিল এমন এক স্বাভিমানবোধ যা এই জন বিদ্রোহের মূলে কাজ করেছিল। কিন্তু এই জনবিদ্রোহ পূর্ব পরিকল্পনা বা সংগঠিত পথে হয়নি। সিংহের মতো ক্রোধ ও অন্ধ আবেগে পরিণামী জয় পরাজয় সম্পর্কে বিন্দুমাত্র চিন্তা না করেই তারা অত্যাচারী হিরণ্যকশিপুর উপর ঝাঁপিয়ে পড়েছিল এবং দৈত্যরাজ ও তার সকল প্রধান সহযোগীদের হত্যা করেছিল। সিংহের ক্রোধের মতো প্রবল জনশক্তি উদ্বেল হলে তার কোনো রাশ থাকে না। সে সময় জনশক্তির রূপ এমন ভীষণাকার ধারণ করেছিল যে কেউ তা প্রতিরোধ করতে পারেনি। এমনকি স্বয়ং প্রহ্লাদও বিস্ময় বিস্ফারিত নেত্রে কেবল দেখে যাচ্ছিল। মনে হয় এই ঘটনাটি আমাদের প্রাচীন ইতিহাসে জাতীয়তাবোধের প্রথম উদাহরণ।

ভারতীয় জাতীয়তাবোধের ক্ষেত্রে প্রথম থেকেই একথা স্বীকার করা হয়েছে যে, ন্যায় ও নীতি' আশ্রিত আচরণের মধ্য দিয়েই মনুষ্যত্বের পরিচয়। এইসব গুণহীন ব্যক্তি মানবশরীরধারী হলেও পশুতুল্য। গুণানুসারে মানুষকে পশুস্বভাব দিয়ে চিহ্নিত করা হয়। যেমন বিক্রম বোঝাতে সিংহ বা বাঘের সঙ্গে তুলনা করা একটি প্রচলিত রীতি। 'বাংলার বাঘ আশুতোষ' বললে বাঘের বিক্রমের ন্যায় আশুতোষের বিক্রম বুঝি। তেমনই নৃসিংহ বলতে সিংহবিক্রম সম্পন্ন মানুষকে বোঝায়। যাহোক, নৃসিংহ অবতারের কালে যে গণবিদ্রোহ দেখা দিয়েছিল তা পরবর্তীকালের ফরাসী বিপ্লবের জনরোষের সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে। কিন্তু এক্ষেত্রে কাজের মূলে সৎচিন্তা, সাহস ও ত্যাগের গুণ থাকলেও সংগঠিত সামর্থ্য থেকে তা উদ্গত হয়নি। এতে এক সংযমশীল সমর্থ সংগঠনের অভাব ছিল। সেজন্য গণক্রোধ জ্বালামুখীর মতো বিস্ফোরণ ঘটিয়ে আবার অল্প সময়েই শান্ত হয়ে গিয়েছিল। প্রহ্লাদ খুবই ভালো ছিল। কিন্তু একথা সত্য তিনি দৈত্য হিরণ্যকশিপুর পুত্র এবং বিদেশী বংশোদ্ভূত। তবুও সে ভারতীয় সংস্কৃতিকে স্বীকার করে নিয়েছিল বলে ভারতীয়রা তাকে রাজা হিসেবেও মেনে নেয়। প্রহ্লাদ অত্যন্ত বুদ্ধিমান ও নীতিজ্ঞ ব্যক্তি ছিলেন। কিছু ক্ষেত্রে তাঁর সঙ্গে আকবরের তুলনা করা যায়। যেমন, অল্পবয়সে, অনাকাঙ্ক্ষিত পরিবেশে তিনি সিংহাসনে আরোহণ করেন এবং সুশাসন প্রবর্তন করেন। বিদেশী শাসন কেবল অত্যাচারীর বলের উপর নির্ভর করলে তার অবসন ঘটানো এতো কঠিন হয় না। কিন্তু যদি সুরাজ্য শাসন চলছে বলে জনসাধারণের বিশ্বাস সৃষ্টি করা যায়, তবে তার বিরুদ্ধে কোনো আন্দোলন করা কঠিন হ'য়ে পড়ে। কিন্তু এই পরিস্থিতিতেও বুদ্ধিমত্তা ও রাষ্ট্রভক্তির সাহায্যে বিদেশীদের হীনবল ক'রে এদেশ থেকে বহিষ্কার করার একটি প্রচেষ্টা হয়েছিল। সেই প্রচেষ্টা ফলপ্রসূ হ'ল বামন-অবতারে দৈত্যরাজ বলিকে পাতালে পাঠানোর মাধ্যমে।

বামনাবতার ঃ জাতীয়তাবাদের সুস্পষ্ট প্রকাশ

ভগবান বিষ্ণুর পঞ্চম অবতার বামন। এই অবতারে তিনি দৈত্যরাজ বলিকে বধ করেন এবং রসাতলে পাঠিয়ে দেন। এই কাহিনীর তাৎপর্য হ'ল এই সময় বামনাবতারের নেতৃত্বে ভারতীয় জাতীয়তাবাদের সুস্পষ্ট প্রকাশ ঘটে।

প্রহ্লাদ ভারতীয় সংস্কৃতিকে স্বীকার ক'রে নিয়ে রাজত্ব চালাচ্ছিল। পরে দেবরাজ ইন্দ্র ব্রাহ্মণবেশে প্রহ্লাদের সেবক হ'য়ে তার কাছে বসবাস করতে লাগল। দীর্ঘ বারো বছর পরে তার সেবায় তুষ্ট প্রহ্লাদ তাকে বর দিতে চাইলে ব্রাহ্মণবেশী ইন্দ্র তাঁর শীল (গুণসমূহ) প্রার্থনা করল। এই শীল আর কিছুই নয়, দৈত্যদের রাজ্য পরিচালন পদ্ধতি। প্রহ্লাদ শীলহীন হ'য়ে পড়লে ইন্দ্র প্রত্যক্ষ বিরোধিতায় না গিয়েও প্রহ্লাদের রাজ্য অধিকার ক'রে নিল। আগেই বলেছি (দ্র. নৃসিংহাবতার) বুদ্ধিমত্তা ও রাষ্ট্রভক্তির সাহায্যে বিদেশীদের হীনবল ক'রে বহিষ্কার করার একটি প্রচেষ্টা হয়েছিল যা বামন অবতারে সাফল্য লাভ করে। প্রহ্লাদ যতই বিষ্ণুভক্ত হোক না কেন, আদতে সে তো দৈত্য; সে তো বিদেশী। সুতরাং ছলে-বলে কৌশলে বিদেশীদের হাত থেকে দেশকে উদ্ধার করতে হবে। সে যুগে ভারতীয়রা তারই আন্তরিক চেষ্টা করেছিল।

প্রহ্লাদের পুত্র বিরোচন, বিরোচনের পুত্র বলি। বলি তপস্যা বলে অজর অমর হ'য়ে ত্রিভুবনের অধীশ্বর হ'য়ে বসল। ইন্দ্রাদি দেবতারা যুদ্ধে পরাস্ত হলেন। এই বলির হাত থেকে পৃথিবী উদ্ধার করার জন্য বিষ্ণু বামন অবতার হলেন। বলি ত্রিভুবন জয় করে যজ্ঞ করতে লাগল। যার ফলে জনমানসে শ্রদ্ধা প্রীতি, কৃতজ্ঞতার সঞ্চার হলো। সাধারণ মানুষ ভাবলো, বলি গণ্যমান্য ব্যক্তি, সততাই তাঁর আশ্রয়। তার কাছে যে কেউ দুঃখ নিবেদন করলে তিনি তা নিবারণ করেন। বলি ধীরে ধীরে মানবের হৃদয় সিংহাসনে বসলে ইন্দ্র প্রমাদ গণলেন। শত্রুরাজা প্রজাবৎসল হ'লে উৎখাত করা কঠিন। তবু ইন্দ্র চেষ্টা করতে লাগলেন। বিদেশী রাজাকে উৎখাত করতেই হবে।

বলিররাজ্যে জনসাধারণ সুখে বাস করলেও স্বাধীনতা ছিল না। বলির শাসনের সঙ্গে বৃটিশ শাসনের তুলনা করা যায়। বৃটিশ রাজত্বে সুখ থাকলেও স্বাধীনতা ছিল না। বলির সময়ে এমন অবস্থাই ছিল। কারণ বলি তো বিদেশী শাসক। ইন্দ্র সেই সুযোগ গ্রহণ করলেন। শাসনকার্যের সমস্ত প্রধান পদে বলি বিদেশী দৈত্য ও অসুরদের নিয়োগ করেছিল। বিষয়টি

সাধারণ মানুষের দৃষ্টি এড়িয়ে যায়নি। সে যুগের ভাবুক সমাজ অনুভব করছিল এমন অবস্থা চলতে থাকলে এদেশের মানুষ অধঃপাতে যাবে এবং ভারতীয় সংস্কৃতি বিনষ্ট হবে। এমন কি ভারতীয় জাতিসত্তা বিলুপ্ত হবে। ধীরে ধীরে এই ধারণা জনমনে তুষের আগুনের মতো ধিকিধিকি জ্বলতে লাগল। দেবরাজ ইন্দ্র সেই আগুনে বাতাস দিতে লাগলেন। কিন্তু এই রোষাগ্নিকে কাজে লাগাবে কে? পুরোহিত ব্রাহ্মণরা বলির কাছ থেকে যথেচ্ছ দক্ষিণা পেয়ে খুব খুশি। ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যদের উপর বলির তীব্র দৃষ্টি। একটু বিদ্রোহের আভাস পেলেই তাদের বধ করছে। আর সাধারণ মানুষ স্বার্থপর, তাদের লোভ দেখিয়ে, ভয় দেখিয়ে বলি দাবিয়ে রেখেছে। জনরোষ এমন পর্যায়ে গিয়ে পৌছালো যে নারীরাও অতিষ্ঠ হয়ে উঠলো। দেবমাতা অদিতি এই শাসনব্যবস্থা উচ্ছন্নে যাবার সংকল্প করে তপস্যায় বসলেন একটি সুপুত্র কামনায়। তাঁর গর্ভে আবির্ভূত হলেন বামন—অবতার রূপে স্বয়ং বিষ্ণু। শিশুকাল থেকে বামন যেমন সাহসী, তেমন উদ্যমী। বামন অর্থাৎ বেঁটে। এটিও একটি প্রতীক। বেঁটে লোকের বুদ্ধি প্রখর এর বস্তুর প্রয়োজন অল্প। বলির রাজত্বে সুকৌশলে বর্ণাশ্রম ব্যবস্থা ভেঙে দেওয়া হল। ব্রাহ্মণরা পঠন-পাঠন করে না। ক্ষত্রিয়দের হাতে দেশরক্ষার দায়িত্ব নেই। বৈশ্যদের হাতে নেই বাণিজ্যের ভার। সবকিছুর দায়িত্ব দৈত্য ও অসুরদের উপর ন্যস্ত। বামন পুনরায় বর্ণাশ্রম প্রথা ফিরিয়ে আনার কথা বলতে লাগল। জনসাধারণ বামনকে বিপুল সমর্থন দিল। বলি বামনকে প্রভূত ঐশ্বর্যের লোভ দেখিয়েও নিরস্ত করতে পারলো না। বামনের আন্দোলন দিন দিন শক্তিশালী হতে লাগল। বলি বামনের সঙ্গে একটি বোঝাপড়ায় আসতে চাইল। গুরু শুক্রাচার্য বাদ সাধলেন। তিনি স্বপক্ষ নিষ্ঠ ছিলেন। তাই তিনি একচক্ষুবিশিষ্ট। তিনি বলিকে বামনের আন্দোলন ধ্বংস করতে পরামর্শ দিলেন। বলি রাজি হলেন না। ক্রুদ্ধ শুক্রাচার্য বলিকে রাজ্যভ্রষ্ট হবার অভিশাপ দিলেন। তবুও বলিরাজ শুক্রাচার্যের কথা শুনলেন না। তিনি আপোষ মীমাংসার পথ ধরলেন। বামনের দাবী ছিল তিন বর্ণের লোককে নিজ নিজ বর্ণানুযায়ী কাজ করতে দিতে হবে। তাই তিনি বলির কাছে ত্রিপাদ ভূমি চেয়েছিলেন। এতে বলির আপত্তি ছিল না। বামনের প্রথম দাবী, বলিকে যজ্ঞ বন্ধ করতে হবে। বিরোচন ও শুক্রাচার্যের শিক্ষাপদ্ধতি রাজ সমর্থন পাবে না। দ্বিতীয় দাবী রাজকার্যে ও সেনাবাহিনীতে ক্ষত্রিয়দের নিযুক্ত করতে হবে। আর তৃতীয় দাবী ভারতীয় বৈশ্যদের উপর থেকে ব্যবসা-বাণিজ্যের নিষেধাজ্ঞা তুলে নিতে হবে। বলি প্রথম দাবি মেনে নেন, পরে দ্বিতীয় দাবী মেনে নেন, কিন্তু বলির অমাত্যবর্গ এই দ্বিতীয় দাবী মানতে চায়নি। তখন বামনের সৈন্যদের সঙ্গে তাদের যুদ্ধ শুরু হয়। বলি কঠোরভাবে সেই যুদ্ধ বন্ধ করেন। দৈত্য ও অসুররা পিছিয়ে আসে। কিন্তু তৃতীয় দাবী মানতে বলি ইতস্ততঃ করতে লাগলেন। কারণ ভারতীয় বৈশ্যদের উপর থেকে নিষেধাজ্ঞা তুলে নিলে অসুর বণিকরা বাণিজ্যে টিকে থাকতে পারবে না। তারা পিছু হঠতে বাধ্য হবে। ফলে বলির রাজত্বের মূল ভিত্তিটাই ভেঙে যাবে। এই সময়ে বলির চোখ খুলে

যায়। তিনি বুঝতে পারেন তাঁর হাত থেকে সমস্ত ক্ষমতা সরে যাচ্ছে। তিনি প্রতিকারের চেষ্টা করেও ব্যর্থ হন। দুই অধিকারের বলে বলীয়ান হয়ে বামন বলিকে সিংহাসনচ্যুত করেন। তারপর তাকে বরুণ পাশে বদ্ধ করেন, যাতে পালাতে না পারে। তাই প্রচলিত আছে, বামন তাঁর তৃতীয় পদ বলির মস্তকে স্থাপন করেন।

অতঃপর বামন বলিরাজকে দক্ষিণ ভারতের পশ্চিম অঞ্চলে বসবাসের জন্য প্রেরণ করেন। আধুনিক পরিভাষায় বলিকে রাজবন্দী হিসেবে রাষ্ট্রীয় সুরক্ষার সঙ্গে রাখা হয়েছিল। বামনের এই কাজ জাতীয়তাবোধ ব্যতীত সম্ভব ছিল না। বামন সম্পূর্ণ ন্যায়নিষ্ঠ পুরুষ ছিলেন। তাঁর মনে স্বার্থপরতা ক্ষণকালের জন্যও স্থান পায়নি। এই ঘটনার পর জনসাধারণ তাঁকে রাজা করতে চাইলেও তিনি রাজী হননি। বলিকে পর্যুদস্ত করে বামন দেশপ্রেমের এক অভূতপূর্ব আদর্শ স্থাপন করেছেন। বামন স্বর্গলোকে দ্বিতীয় পদ স্থাপনের পর ব্রহ্মা নিজ কমণ্ডলুর জল দিয়ে তাঁর পদ ধৌত করেন। ঐ পবিত্র পদের ধৌত ধারাই পরম পবিত্র গঙ্গা নদী।

বামনের এই কাজের ফলে, বলির শাসন থেকেই যে ভারতবর্ষ মুক্তিলাভ করেছিল তা নয়; বিদেশী আক্রমণও বন্ধ হ'য়ে সীমান্ত সুরক্ষিত হয়। অর্থাৎ বায়ব্য দিশা (উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত) দিয়ে আর কোনো বিদেশী আক্রমণ হয়নি। ফলে জনসাধারণ এত তৃপ্ত হয়েছিল যে, 'বামন-জয়ন্তী' পালন করতে শুরু করলো। এই কাজের ফলে দেশ থেকে দৈন্য, দাস্যভাব ও নিরাশার অন্ধকার দূরীভূত হয়। এই কথা প্রকাশ করার জন্য জনসাধারণ কয়েকদিন ধরে ঘরে ঘরে দীপ জ্বেলে উৎসব পালন করে; যা আজও 'দীপাবলী' নামে পরিচিত। বিদেশী শাসনের প্রতি ঘৃণা থাকলেও বিদেশীর প্রতি ঘৃণা থাকা উচিত নয়—ভারতীয়দের এই সাত্ত্বিক চিন্তা থেকেই বলির সুশাসনের স্মরণে 'বলি প্রতিপদ' উৎসব পালন করা হয়।

ন্যায় ও নীতি রক্ষা ক'রে স্বাভিমানী জীবন যাপন করাই মনুষ্যত্ব। এটিই ভারতীয় সংস্কৃতির মূল কথা। এই মনুষ্যত্ব যা জাতীয়তার নামান্তর তা এই পাঁচ অবতারের মধ্যে দিয়ে স্পষ্ট প্রকাশিত হয়েছে। এই সময় জাতীয়তাবোধ সকলের মধ্যে জাগ্রত হলেও পূর্ণমাত্রায় হয়নি। এই জাতীয়তাবোধকে মানুষ রূপে দেখলে বলা যায় এর উচ্চতা বেশি ছিল না। মৎস্য থেকে বামন পর্যন্ত অবতারের কালপর্বে জনগণের মনে এই ধারণা স্বল্প ছিল বলেই বামন অবতার ছিলেন বেঁটে। তবুও জাতীয়তাবোধের ব্যাপক প্রচার ও প্রয়োগ বামন অবতারের সময় প্রথম হয়েছিল। যার ফলে বলিরাজের সুবিন্যস্ত শাসন পদ্ধতিও অকেজো হয়ে গেলো। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় এই জাতীয়তাবাদ দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। তাই এই অবতারের নাম 'বামন'। বলির যজ্ঞমণ্ডলে বামন বিশাল রূপ ধারণ করে একটু পরেই সৌম্যরূপ ধারণ করেন। এই বর্ণনার মধ্যে দিয়ে পুরাণকার উক্ত ঐতিহাসিক ঘটনারই সঙ্কেত দিয়েছেন।

পরশুরাম অবতার ঃ শক্তির দম্ভনাশ

ভগবান বিষ্ণুর ষষ্ঠ অবতার পরশুরাম। কবি জয়দেবের দশাবতার স্তোত্রে তাঁকে এইভাবে দেখতে পাই—

"ক্ষত্রিয়রুধিরময়ে জগদপগতপাপম্
স্নপয়সি পয়সি শমিত ভবতাপম্
কেশব ধৃতভৃগুপতিরূপ জয় জগদীশ হরে।।"

পরশুরাম ক্ষত্রিয়রুধিররূপ জলে জগৎকে স্নান করিয়ে তার পাপ ধৌত করেন এবং সংসারের তাপ শান্ত করেন। পরশুরামের কীর্তিকলাপের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হ'ল সেই সময়ে সমাজে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত ব্যক্তিসত্তার সঙ্গে সমাজসত্তার মেলবন্ধন ঘটানো। এই মেলবন্ধনে ভারতের জাতীয় জীবনে এক অভূতপূর্ব সমৃদ্ধির সৃষ্টি হয়েছিল; যার অব্যবহিত ফল শ্রীরামচন্দ্রের আবির্ভাব। পরশুরামের কার্যকলাপ যেমন উল্লেখযোগ্য তেমন কৌতূহলোদ্দীপক তাঁর চরিত্রকথা; যা পুরাণে বর্ণিত হয়েছে—

কান্যকুব্জদেশে গাধি নামে এক রাজা ছিলেন। তাঁর কন্যা সত্যবতীর সঙ্গে বিদ্বান ঋষি ঋচীকের বিবাহ হয়। মহারাজ গাধি ও জামাতা ঋচীক উভয়েই পুত্রহীন ছিলেন। ঋচীক পুত্রলাভের আশায় ব্রহ্মশক্তির সহায়তায় ক্ষীর তৈরী করে পত্নী সত্যবতীকে খেতে দিলে তিনি তাঁর মায়ের জন্য ক্ষীর প্রার্থনা করেন। ঋষি ঋচীক ক্ষাত্রবীর্য সংগ্রহ করে ক্ষীর প্রস্তুত ক'রে তার মায়ের জন্য দিয়ে কার্যব্যপদেশে অন্যত্র গমন করেন। ঋচীক প্রথম ক্ষীরটি পত্নী সত্যবতীকে এবং দ্বিতীয়টি তার মাতাকে খেতে বলেন। সত্যবতী মাতাকে সমস্ত কথা বললে, মাতা ভাবলেন সকলেই তো চায় নিজের পুত্র গুণবান হোক; তাহলে নিশ্চয় প্রথম ক্ষীরটির মধ্যে সর্বগুণবান পুত্র লুকিয়ে আছে। তিনি সত্যবতীর ক্ষীর খেলেন আর সত্যবতী তার মাতার ক্ষীর খেলেন। এই প্রলয়ঙ্করী স্ত্রী বুদ্ধির জন্য ভারতবর্ষের কী দুর্দশা হ'ল দেখুন। ঋচীক ফিরে এসে পত্নীর মুখে ক্রূরতার ছাপ দেখে বুঝলেন ক্ষীর খেতে গণ্ডগোল হয়েছে। তিনি বললেন—'এই গণ্ডগোলের জন্য তোমার ছেলে ক্রূরকর্মা ক্ষত্রিয় হবে, আর তোমার ভাই ব্রাহ্মণের গুণ প্রাপ্ত হবে।' সত্যবতী ক্ষমা প্রার্থনা ক'রে বললেন— 'আমার পুত্র যেন ক্ষাত্রগুণ না পায়। আমার পৌত্র ক্ষাত্রগুণ লাভ করুক।' ঋচীক সেই আশীর্বাদ করলে সত্যবতীর পুত্র জমদগ্নি ধনুর্বিদ্যায় নিপুণ হয়েও তপস্বীর জীবনযাপন করতে লাগলেন আর তার পুত্র পরশুরাম

পেলেন ক্রুরকর্মা ক্ষত্রিয়ের সকল গুণ। তিনি অত্যন্ত তেজস্বী, শস্ত্রবিদ্যায় সুনিপুণ ও পিতামাতার প্রতি ভক্তিমান ছিলেন। তিনি সবসময় কাঁধে একটি কুঠার নিয়ে ঘুরে বেড়াতেন। তাই তার নাম হ'ল পরশু (কুঠার) রাম।

জমদগ্নি ছিলেন ব্রাহ্মণগুণ সম্পন্ন। তিনি নর্মদা তীরে সপরিবারে আশ্রম নির্মাণ ক'রে বসবাস করতেন। জমদগ্নি মুনির আশ্রম থেকে কিছু দূরে বিখ্যাত হৈহয় বংশের রাজাদের রাজ ধানী ছিল। সেখানে সহস্রার্জুন নামে এক রাজা তখন রাজত্ব করতেন। ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠ পাঁচজন রাজার অন্যতম এই সহস্রার্জুন। বাকি চারজন হলেন—পৃথু, ভরত, নল, রামচন্দ্র। সহস্রার্জুন অত্রিপুত্র দত্তাত্রেয়ের ভক্ত ছিলেন। দত্তাত্রেয় তাঁকে দুটি বর দান করেন—(ক) যুদ্ধের সময় তার সহস্রবাহু হবে (খ) তার চেয়ে শ্রেষ্ঠ কোনো পুরুষের হাতে তার মৃত্যু হবে। ঐ সহস্র বাহু আসলে তাঁর বিশ্বস্ত অনুগামীবৃন্দ। তিনি কঠোর পরিশ্রম করে বিশ্বস্ত অনুগামীদের তৈরী করেছিলেন। আপন অনুগামীদের সঙ্গে তিনি একাত্ম হয়ে গিয়েছিলেন। এইভাবে তিনি এক অভেদ্য সংগঠন তৈরী করেন। সংগঠন গড়ার এই বিদ্যা তিনি দত্তাত্রেয়ের কাছ থেকে অর্জন করেন। এমন অতুলনীয় বুদ্ধি সামর্থ্য ও সংগঠনকুশলতা তিনি রপ্ত করেছিলেন যে, লোকের আদর্শ স্থানীয় হয়ে ওঠেন। এমন সমর্থ পুরুষের প্রচন্ড সাহস ও অহঙ্কার থাকা স্বাভাবিক। তার প্রার্থিত দ্বিতীয় বরটির মধ্যে এই অহংকার লুকিয়ে রয়েছে। কিন্তু এমন সংগঠনেরও ত্রুটি ছিল। তিনি এই ভয়ে সর্বদা ভীত ছিলেন যে, এমন সংগঠন হয়তো কেউ গড়ে ফেলবে। তাই তিনি অনুগামীদের নানা কাজে বিশেষতঃ রাজ্যজয়ের কাজে লিপ্ত রাখতেন। ফলে তার সংগঠন স্বার্থচিন্তার উপর নির্ভরশীল হ'য়ে পড়ল। এক কথায় সাম্রাজ্যবাদী, লুণ্ঠনকারীর সংগঠন হ'য়ে গেল। আর জনগণ থেকে দূরে সরে গেল।

জমদগ্নির আশ্রম সহস্রার্জুনের রাজধানীর নিকটেই ছিল। জমদগ্নির কাছ থেকে পুত্র পরশুরাম তেজস্বিতা ও অস্ত্রবিদ্যা শিখেছিলেন। তিনি সহস্রার্জুনের অন্যায় ঘোষণার বিরোধিতা করলেন। সহস্রার্জুন ঘোষণা করেছিলেন যে, তিনি রাজা, সকল লোককে রক্ষার দায়িত্ব তাঁর। সুতরাং তাঁর এলাকায় অন্য কেউ যেন অস্ত্রধারণ না করে; করলে তার প্রাণদণ্ড দেওয়া হবে। পরশুরাম একথা কেন শুনবেন? তিনি সর্বদা একটি কুঠার নিয়ে তাঁর কাঁধে রাখতেন। তাঁর দেখাদেখি অনেকেই কুঠার-কাঁধে ঘুরতে লাগল। সহস্রার্জুনের আদেশ অমান্য ক'রে কাঁধে কুঠার নিয়ে সর্বদা বেড়াবার ফলে অন্যেরা তাকে সাহসী মনে ক'রে তাঁর অনুগামী হয়ে উঠল। সহস্রার্জুন তাঁর অনুগামীদের থেকে সব শুনলেন; তবু বিবাদে লিপ্ত হলেন না। কিন্তু পরশুরামের ঔদ্ধত্যও তাঁর অসহ্য হল। অবশেষে পরশুরামের সঙ্গে বিরোধ করার জন্য, অর্থাৎ পরশুরামকে দমন করার জন্য অনুগামীদের দিয়ে জমদগ্নি মুনির হোমধেনুর বাছুর চুরি করালেন। আশ্রমবাসীরা রাজার কাছে নালিশ করলে সহস্রার্জুন বিরক্ত হয়ে বললেন, পরশুরাম থাকতে আমাকে বলছেন কেন? পরশুরাম সন্ধ্যার সময় ঘরে ফিরে সকল কথা শুনলেন। আর এই অন্যায়ের অবসান করার জন্য তিনি সহস্রার্জুনের রাজধানী আক্রমণ করলেন। তারপর নিজের অনুগামীদের

সাহায্যে সহস্রার্জুনের বাহুতুল্য সকল বিশ্বস্ত অনুচরদের বধ করালেন। প্রসঙ্গতঃ বলি আমরা খুব বিশ্বস্ত অনুগামীদের ডানহাত-বামহাতের সঙ্গে তুলনা করি। সুতরাং সহস্রার্জুনের সহস্রবাহু বলতে সহস্র বিশ্বস্ত অনুচর বোঝায়। যাহোক, তিনি সহস্রার্জুনকে বধ করে নিজ গাভীর বাছুর নিয়ে আশ্রমে ফিরে আসেন। সহস্রার্জুনের পুত্র নিজ পিতার মতই ক্ষাত্রবৃত্তি সম্পন্ন ছিলেন। ফলে প্রতিশোধ গ্রহণের স্পৃহা তার মধ্যে জেগে ওঠে। সে পিতৃহত্যার প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য সুযোগ খুঁজতে লাগল।

পরশুরাম ভ্রমণ করতে ভালোবাসতেন। তিনি সমস্ত ভারতবর্ষ তীর্থযাত্রীরূপে ভ্রমণ করেন। একবার তীর্থযাত্রা উপলক্ষে তিনি বহু দূরে গেলে সহস্রার্জুনের পুত্র পরশুরামের আশ্রম আক্রমণ ক'রে পিতা জমদগ্নিকে হত্যা করে। তীর্থ থেকে ফিরে পরশুরাম মায়ের মুখে সব শুনে ক্রোধে অগ্নিশর্মা হয়ে প্রতিজ্ঞা করলেন। জগতের সমস্ত ক্ষত্রিয়ের শোণিতে পিতৃতর্পণ করবেন। করলেনও তাই। এই পৌরাণিক কাহিনীর রূপকের আচ্ছাদনটি সরিয়ে দিলে দেখা যায় যে, পরশুরাম সহস্রার্জুনের প্রতাপ ও তেজের রহস্য পূর্বেই জেনেছিলেন। সেজন্য অন্যায়ের প্রতিবাদকল্পে তিনি এক নবীন সংগঠন তৈরী করেন। স্বার্থপর সংগঠন ও পরার্থপর সংগঠনের মধ্যে প্রচুর পার্থক্য। পরশুরাম এই পরার্থপর সংগঠনের সাহায্যে স্বার্থপর সংগঠনের নেতা সহস্রার্জুনকে হত্যা করলেন। নিজের থেকে শ্রেষ্ঠ লোকের হাতে নিহত হওয়ার জন্য সহস্রার্জুনের বাসনাও পূর্ণ করলেন।

পরশুরাম সহস্রার্জুনকে বধ করার পর আবার তীর্থযাত্রায় মন দিলেন। কিন্তু তাঁর অনুগামীরা কী করবে? তারা সহস্রার্জুনের বিশাল সাম্রাজ্য লুঠ-পাট করতে লাগল। একদিন কিছু লোক পরশুরামের কাছে তার অনুগামীদের কুকীর্তির কথা প্রকাশ করলে তিনি তাঁর অনুগামীদের ধ্বংস করলেন। এই ধরণের কাজ তাঁকে বেশ কয়েকবার করতে হয়। পুরাণকার তাকেই পরশুরাম কর্তৃক একুশবার পৃথিবী নিঃক্ষত্রিয় করার কথা বলেছেন। পরশুরাম ক্ষত্রিয়শক্তির দম্ভনাশ করেছিলেন। তবে ক্ষত্রিয়দের সংহার না করে নিয়ন্ত্রণ করলে ভালো হত। সমাজের কল্যাণের জন্য চতুর্বর্ণের প্রয়োজন। সেক্ষেত্রে ক্ষত্রিয়েরও অবশ্য প্রয়োজন। সমাজে ক্ষত্রিয়দের রক্ষা করা বিচারশীল বুদ্ধিমান নেতৃত্বের একান্ত কর্তব্য। কিন্তু এই তত্ত্বজ্ঞানে সচেতন না হয়ে ব্যক্তিগত অপমানে দীর্ণ পরশুরাম কেন যে এই ক্ষত্রিয় সংহারের কাজটি অত্যুৎসাহে করতে লাগলেন তা সহজে বোঝা যায় না। তিনি অবতার পুরুষ। তিনি হয়তো এমন কিছু ক্ষতির অশনি সংকেত পেয়েছিলেন যা দেশকে আরও ক্ষতিগ্রস্ত করতো। তাই তিনি দেশকে রক্ষার জন্য ক্ষত্রিয়দের হত্যা করেন। ভারতবর্ষকে উন্নতির পথে এগিয়ে নিয়ে যান। তিনি তাঁর বিজিত সমস্ত রাজ্য মহর্ষি কাশ্যপকে দান করে দিয়ে দাক্ষিণাত্যে চলে যান। এখানেই তাঁর মহত্ত্ব। কাশ্যপ অরাজক ভারতবর্ষকে শৃঙ্খলা ও সুশাসনের সাহায্যে সুগঠিত করেন। পরশুরাম অবতারের প্রধান কর্তব্য পরার্থপর সংগঠনের সাহায্যে স্বার্থপর সংগঠন ধ্বংস করা। ভারতীয় জাতীয়তাবাদের ক্ষেত্রে আজও এই আদর্শের একান্ত প্রয়োজন। তবে যদি দলতন্ত্ররোধ ক'রে প্রকৃত গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা যায়।

রামাবতার ঃ রাক্ষস সংস্কৃতির অবসান

ভগবান বিষ্ণুর সপ্তম অবতার শ্রীরামচন্দ্র। ইনি রাক্ষসরাজ রাবণকে যুদ্ধে বধ করেছিলেন। ভারতীয় সমাজে রামচন্দ্রের আরও একটি উল্লেখযোগ্য অবদান হ'ল সুশাসন, রামরাজ্য প্রতিষ্ঠা। আজও সুশাসিত রাজ্যের নাম রামরাজ্য।

ঋষি বিশ্বামিত্রের সাহচর্যে ছেলেবেলা থেকেই রাম-লক্ষ্মণ ভারতীয় রাজনীতি পাঠের প্রচুর সুযোগ পান। তাই ছেলেবেলা থেকেই রাক্ষস সংস্কৃতি ধ্বংসের জন্য তাঁরা নিজেদের উৎসর্গ করেন। তাড়কা রাক্ষসী বধ তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। বিশ্বামিত্র তাঁদের শুধু শাস্ত্রশিক্ষা দিয়েই ক্ষান্ত হননি; শস্ত্রশিক্ষাও দিয়েছিলেন। সারা দেশের পরিস্থিতি বিশ্বমিত্রের ভালোভাবেই জানা ছিল। তখন দেশের পরিস্থিতি অত্যন্ত বিচিত্র ছিল। ঋষিদের প্রায় সকল আশ্রম বন্ধ ছিল। রাক্ষসদের উৎপাতে ও আতঙ্কে যাগযজ্ঞাদি করা অসম্ভব হয়ে উঠেছিল। কোথাও বেদপাঠ হতো না। রাক্ষসদের অত্যাচারে সাধারণ মানুষ ত্রস্ত হ'য়ে উঠেছিল। ধনধান্য পুষ্পে ভরা বসুন্ধরা রাবণের রাক্ষসরা শ্মশান ক'রে তুলেছিল। রাক্ষসদের উৎপাতে স্থানে স্থানে নরকঙ্কালের স্তূপ জমে উঠেছিল। বিশ্বামিত্র রাম-লক্ষ্মণকে নিয়ে রাক্ষস নিধনের কাজে নামলেন। প্রথমে তিনি রাম-লক্ষ্মণকে দিয়ে তাঁর যজ্ঞ রক্ষা করান। ফলে মুনিঋষিরা তাদের আশীর্বাদ করতে লাগলেন; তাদের সুখ্যাতি করতে লাগলেন। বিশ্বামিত্র অতঃপর রাম-লক্ষ্মণকে নিয়ে জনকপুরী মিথিলায় চললেন। সেখানে হরধনু ভঙ্গ করে রামচন্দ্র সীতাকে বিবাহ করলেন। এই হরধনু পরশুরাম জনক রাজার কাছে গচ্ছিত রেখেছিলেন। হরধনু ভঙ্গের মধ্য দিয়ে রামচন্দ্রের খ্যাতি চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ল। মানুষ রামচন্দ্রকে আশ্রয় ক'রে আশায় বুক বাঁধলো। এইবার হয়তো রাক্ষসদের অত্যাচার থেকে রক্ষা পাওয়া যাবে। রামচন্দ্র জনসাধারণকে আশ্বাস দিলেন।

সীতাকে বিবাহ ক'রে অযোধ্যায় ফেরার পথে পৃথিবী নিঃক্ষত্রিয়কারী ভীষণ পরশুরাম ক্রুদ্ধ হয়ে সকলের পথ রুদ্ধ করে দাঁড়ালেন। এই সময় বশিষ্ঠ বা দশরথ কেউই পরশুরামের সঙ্গে কথা বলতে এগিয়ে আসেননি। রামচন্দ্রই কুশলতার সঙ্গে সেই ভয়ানক পরিস্থিতি সামলান। তিনি শান্ত চিত্তে পরশুরামকে বুঝিয়ে দিলেন, সমাজরক্ষাকারী ক্ষত্রিয়দের নির্বিবাদে বধ ক'রে তিনি দেশের কত ক্ষতি করেছেন। কারণ, দেশ আজ নিঃক্ষত্রিয় হওয়ায় বিদেশী রাক্ষসদের অত্যাচার প্রতিহত করার কেউ নেই। দেশের সাধারণ মানুষকে শৌর্যবীর্যহীন করে

তোলার সকল দায় তাঁর। এই কথা শুনে পরশুরাম প্রথমে নিরুত্তর রইলেন, তারপর তাঁর ভুল স্বীকার করলেন। এই পাপের জন্য তাঁর তেজোহরণ করা হ'ল। তাঁর স্বর্গে যাবার পথ অবরুদ্ধ হ'ল। অর্থাৎ তাঁর কোনো প্রতিষ্ঠা-গৌরব আর রইল না। তাঁর প্রভাব শেষ হল। এই ভাবে পরশুরামের মতো মহাবীরকে নিজের সামনে নত করার জন্য রামচন্দ্রের প্রতিষ্ঠা ও গৌরব জনচিত্তে বহুগুণ বর্ধিত হল। রাম ও পরশুরামের এই সাক্ষাতের অন্য একটি ফল দেখা দিয়েছিল। সমাজের চিন্তাশীল ব্যক্তিরা বুঝেছিলেন ক্ষাত্রবৃত্তির পরিপোষণ প্রয়োজন। সমাজ রক্ষণাবেক্ষণে অস্ত্রধারী ক্ষত্রিয়ের প্রয়োজন অছে। সেই সঙ্গে এই ক্ষত্রিয়দের প্রচণ্ড স্বভাবের নিয়ন্ত্রণও প্রয়োজন। রামচন্দ্রের এই মতবাদ সমাজে দ্রুত প্রসার লাভ করলো। ক্ষত্রিয়ের অভাবে বিদেশী আক্রমণে দেশের লোকের দুর্দশার অন্ত থাকে না। তদুপরি দেশে শিল্পকলা, সভ্যতা, সংস্কৃতি নষ্ট হয়ে সমগ্র সমাজ দুর্বল হয়ে পড়ে। ফলে সমাজ রক্ষার উচ্চ আদর্শে স্বদেশ রক্ষায় মৃত্যুভয়হীন চিত্তের ক্ষত্রিয়দের সমাজে বিশেষ প্রয়োজন। এই কথা দেশের সর্বত্র স্বীকৃত হয়। এটিই পরশুরামের তেজোহরণের তাৎপর্যগত অর্থ।

পরশুরামের দর্পহরণের মধ্য দিয়ে রামচন্দ্রের কর্মকাণ্ড শুরু। কৈকেয়ীর জন্য রাম বনবাসী হলেন সত্য, কিন্তু তাঁর এই বনবাসে বশিষ্ঠ, বিশ্বামিত্র কেউ আপত্তি করলেন না। কারণ তারা জানতেন বনবাসে গিয়ে রামচন্দ্র রাবণ বধ করে রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা রক্ষা করবেন। রামায়ণে ভরদ্বাজ মুনির কথায় এর আভাস পাওয়া যায়। রামকে অযোধ্যায় ফিরিয়ে আনার জন্য ভরদ্বাজ আশ্রমে ভরত পীড়াপীড়ি করলে ভরদ্বাজ বলেন—'ভরত, তুমি মাতৃনিন্দা কোরো না। রামের এই বনবাসে লোকের মঙ্গল হবে।' এই কথা থেকে বোঝা যায় রাবণ বধের কল্পনা মুনিঋষিরা বহু আগেই ক'রে রেখেছিলেন। তাঁরা চেয়েছিলেন রাম রাজা হবার আগে রাবণ বধ সম্পন্ন ক'রে নিন। কৈকেয়ীকে দশরথের দেওয়া বর অনুসারে ভরতের তো সিংহাসনে বসার অধিকার ছিল। সেই অধিকার নস্যাৎ ক'রে সিংহাসনের ন্যায্য অধিকারী রামচন্দ্রের রাজা হওয়ার আগে অলৌকিক পুণ্য কাজের অবদান রাখা প্রয়োজন। এই অবশ্য-প্রয়োজন সফল করার জন্য কোশলপক্ষীয় রাজনীতিবিদরা বশিষ্ঠ-বিশ্বমিত্র ভরদ্বাজদের সঙ্গে সহযোগিতা করেন। কারণ রাবণকে যুদ্ধে পরাজিত ও নিহত ক'রে জনসাধারণকে সুখ শান্তি ও নিরাপত্তা যে রাজা দিতে পারেন তিনি রাজা হওয়ার যোগ্য।

রামচন্দ্র চৌদ্দ বৎসর বনবাসে ছিলেন। এই সুদীর্ঘকাল যাবৎ তিনি রাবণবধের প্রস্তুতি নিয়েছেন। অসামান্য নেতৃত্বগুণে তিনি জনসাধারণের মধ্যে আত্মবিশ্বাস ও প্রতিকার সামর্থ্য গড়ে তোলেন। আপন ব্যক্তিত্ব গুণে নতুন মিত্র ও অনুগামী লাভ করেন। বনের সকল ঋষি তাঁকে স্বাগত জানান। বহু রাক্ষস (খর-দূষণ-মারীচ) নিধন ক'রে তিনি জনমানসে শ্রদ্ধার আসন গড়ে তোলেন। এমন কি তিনি বানর জাতির সঙ্গেও মিত্রতা স্থাপন করেন। দীর্ঘকাল যাবৎ সমস্ত রকম প্রস্তুতি নিয়ে তিনি লঙ্কা আক্রমণ করেন এবং শত্রুর রাজধানীতে প্রবেশ

ক'রে তাকে বধ করেন। রাবণবধের জন্য সীতাহরণ তো কেবল নিমিত্তমাত্র ছিল। রামচন্দ্র কোনো লোভের বশবর্তী হয়ে লঙ্কা আক্রমণ করেননি। রারণ কর্তৃক আক্রান্ত নিজ দেশরক্ষায় এটি একটি প্রতি আক্রমণ ছিল। রাবণ ঠিক বিদেশী ছিলেন না; জন্মসূত্রে তিনি ছিলেন ভারতীয়। তিনি ব্রাহ্মণ। বেদাধ্যয়ন করেছিলেন। তিনি বিদ্বান ও পণ্ডিত ছিলেন। কিন্তু স্বভাবে ছিলেন অতিভোগী ও পরদারাসক্ত। অর্থাৎ জন্মসূত্রে ভারতীয় হয়েও তাঁর বৃত্তি রাক্ষস স্বভাবের হয়ে গিয়েছিল। অনেক আগে তিনি লঙ্কায় যান। সেখানকার বিত্ত-বিভব অধিকার ক'রে বাস করতে থাকেন। রাবণের ভারত আক্রমণের অর্থ রাক্ষস সংস্কৃতির দ্বারা ভারতীয় সমাজ ও সংস্কৃতির পরাভব সাধন। রাবণ স্বয়ং এই আক্রমণের নেতৃত্ব দেন। বিভীষণ এই নীতির পক্ষপাতী ছিলেন না। তাই তিনি রামচন্দ্রকে সাহায্য করেন। রাক্ষস সংস্কৃতির সঙ্গে রাবণ এমন একাত্ম হয়ে গিয়েছিলেন যে, রাক্ষসেরা তাকে আপনার লোক বলেই ভাবতো। সীতা অন্বেষণে গিয়ে হনুমান লঙ্কায় বলেছিলেন, রাবণ তো রাক্ষস সমাজে বিদেশী। তার ভোগলালসার জন্যেই রাক্ষসকুল ধ্বংস হবে। এ কথায় রাবণ সম্পর্কে লঙ্কাবাসীর সন্দেহ হয়. লঙ্কার ঘরে ঘরে একথা আলোচিত হতে থাকে। রাবণের সৈন্যদের মধ্যেও অসন্তোষ সৃষ্টি হয়। এই বিষয়টি হনুমানের লঙ্কায় আগুন লাগানো। পুরাণকথার তাৎপর্য বুঝতে তাই একটু ভাবতে হবে।

রামচন্দ্রের আর একটি বৈশিষ্ট্য তাঁর স্বদেশপ্রীতি। লঙ্কাজয়ের পর লক্ষ্মণ রামকে বললেন— 'অযোধ্যায় ফিরে না গিয়ে এই সুবর্ণময়ী লঙ্কায় আনন্দের সঙ্গে রাজত্ব করুন। উত্তরে রামচন্দ্রের সেই বিখ্যাত উক্তি—'অপি স্বর্ণময়ী লঙ্কা ন মে লক্ষ্মণ রোচতে। / জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী।।" মানুষ কেবল যুদ্ধের জন্য জীবিত থাকে না, তাতে জীবনের সার্থকতা নেই. অযোধ্যার পরিস্থিতি জটিল হলেও যাদের আশা-আকাঙ্ক্ষা রামচন্দ্রকে কেন্দ্র ক'রে গ'ড়ে উঠেছে; যাঁরা আকুল হ'য়ে তার পথ চেয়ে বসে আছেন, তাঁদের ত্যাগ ক'রে তিনি অন্য কোথাও থাকতে পারেন না। তাঁর তো কোনো বৈভবের লোভ নেই। তিনি যে কাজ করতে লঙ্কায় এসেছিলেন তা সম্পন্ন হয়েছে। সুতরাং তিনি অযোধ্যায় ফিরে যাবেন। তারপর বিজিত রাজ্যের ভার বিভীষণকে দিয়ে তিনি অযোধ্যার ফিরে এলেন। এই কর্মের মধ্যেই ভারতীয় রাজনীতির সমুচ্চ আদর্শ আমরা দেখতে পাই। বাহ্যতঃ স্বাভাবিক ভোগে থাকলেও অন্তরে নিরাসক্ত থেকে প্রজাদের জন্য, সমাজের জন্য আপন জীবন উৎসর্গ করার অপূর্ব এক নিদর্শন শ্রীরামচন্দ্রের জীবন। প্রজার কল্যাণের জন্য নিজ সুখ বিসর্জন দিয়ে রামচন্দ্র অযোধ্যায় ফিরে আসেন। তাঁর এই লক্ষ্যকে অর্থাৎ প্রজা সন্তুষ্টিকে পূর্ণতা দিতে তিনি সীতাদেবীকেও পরিত্যাগ করেন। কিছুদিন পরে রামচন্দ্র অশ্বমেধ যজ্ঞ সম্পন্ন করেন। তিনি প্রকৃত অর্থে 'আসমুদ্র হিমাচল' একরাট ছিলেন। তাঁর অশ্বমেধ যজ্ঞ এক মহত্ত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক ঘটনা। সমাজের হিতকামনায় 'একরাট' এর স্বীকৃতির জন্যই এই যজ্ঞ করা হয়। রাজ্য রক্ষার স্থায়ী ব্যবস্থা করাই

এর মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল। অশ্বমেধ যজ্ঞের মধ্য দিয়ে ক্ষত্রিয় শক্তিকে ধর্মের নিয়ন্ত্রণে রাখার ব্যবস্থাই সে যুগের সমাজপতিরা করেছিলেন। এই বিধি বিধানের মাধ্যমে এক প্রয়োজনীয় নতুন তত্ত্বও প্রকাশ করা হয়েছিল। তাহ'ল রাজার বলের উৎস প্রজার সহায়তা। এই শক্তি সমাজের শক্তি। সৈন্যবাহিনী কেবল নিজ শক্তিতে দিগ্বিজয় করতে পারে না। এরজন্য সমাজের সহযোগিতা প্রয়োজন। সমাজের সমস্ত লোক নিজ নিজ যোগ্যতা অনুযায়ী সৈন্যবাহিনীর বিজয় লাভে সহায়ক হয়। বাহুবল কেবল বাহুতেই থাকে না, থাকে সমস্ত শরীরে। বাহু কেবল তা প্রকাশ করে মাত্র। কাজেই নিজ শক্তির জন্য দম্ভ প্রকাশ করা ক্ষত্রিয়ের পক্ষে কখনোই উচিত নয়। মুনিঋষিরা সমাজ হিতে নিঃস্বার্থভাবে সমাজনীতি গড়ে তুললেন, রাজা সেই নীতি অনুযায়ী দেশ-শাসন করতে লাগলেন। ভারতে এই পরম্পরা রামচন্দ্রের অশ্বমেধ যজ্ঞের সময় থেকেই চলে আসছে। আমাদের রাষ্ট্রীয় নীতির এই বৈশিষ্ট্য বিশেষ উল্লেখযোগ্য মনে হয়। এই সময় গৈরিক ধ্বজ তৈরী হয়েছিল। গৈরিক বস্ত্র ব্রহ্মবল ও দণ্ড ক্ষাত্রবলের প্রতীক। এই দুয়ের সমন্বয় গৈরিক ধ্বজ। রামচন্দ্র এই সমন্বয় তত্ত্বটি তাঁর রাজ্য শাসনের মাধ্যমে চরিতার্থ করেন। তাই তাঁর রাজ্য আজও আদর্শ রাজ্য রূপে পরিগণিত।

আপাত দৃষ্টিতে মনে হয়, ক্ষত্রিয় সংহারই পরশুরামের কাজ। কিন্তু অস্ত্রধারী ব্যক্তিমাত্রেই ক্ষত্রিয় নয়। পরশুরামের মতে, যারা লোভ লালসা ও আত্মপ্রতিষ্ঠায় মোহগ্রস্ত হয়ে কেবল নিজ শক্তি ও সম্পদ বৃদ্ধির জন্য যুদ্ধ করতো,তারাই ক্ষত্রিয়। তাঁদের বিরুদ্ধে তাঁর অভিযান ছিল। সহস্রার্জুনের বিরুদ্ধে তাঁর অভিযোগ হ'ল, সহস্রার্জুন জনতাকে রক্ষার দায়িত্ব নিজে নিয়ে বিজিত রাজ্যের লোকদের নিরস্ত্র করতেন। এখানেই পরশুরামের আপত্তি। তবে ক্ষত্রিয় হত্যা করে তিনি অনুশোচনা করেছেন; প্রায়শ্চিত্ত করেছেন। মহর্ষি কশ্যপের অনুরোধে পরশুরাম অস্ত্রত্যাগ করেন। পরশুরাম ও শ্রীরাম পরস্পরের পরিপূরক। পরশুরাম যেখানে থেমে ছিলেন, শ্রীরাম সেখান থেকে শুরু করেন। পরশুরাম জীবন প্রান্তে এসে মর্যাদা পালনের কথা ভেবেছেন। শ্রীরাম তা জীবনে প্রয়োগ করে গেলেন। সমাজ রক্ষণ ও সাংস্কৃতিক বিকাশের চিন্তা থেকে তিনি কখনও বিচ্যুত হননি। এই ধ্যেয় চিন্তা থেকেই তিনি ব্যক্তিধর্ম, সমাজধর্ম, হিংসা অহিংসা, ক্ষত্রিয়ত্ব, ব্রাহ্মণত্ব প্রভৃতির মর্যাদা নিজ জীবনে আচরণের মাধ্যমে দেখিয়েছেন। তাই তিনি মর্যাদা পুরুষোত্তম। ভারতের জাতীয় জীবনে শান্তি, সুস্থিতি স্থাপনে এবং এক আদর্শ রাজ্য পদ্ধতি প্রবর্তনে শ্রীরামের অবদান অনস্বীকার্য।

এই রামরাজ্য গঠনে অযোধ্যাবাসী প্রজাদেরও অবদান ছিল। শ্রীরাম নিজ নিষ্ঠা বলে তেজস্বী অযোধ্যাবাসীর বশ্যতা লাভ করেন। সীতা পরিত্যাগের পশ্চাতে এই তেজস্বী অযোধ্যাবাসীর গূঢ় সমর্থন ছিল। রামরাজ্য গড়ার জন্য এক বিশাল সংগঠন তিনি তৈরী করেন। সংগঠন কার্যে তাঁর পূর্বাচার্য ছিলেন কার্তবীর্যার্জুন এবং পরশুরাম। এই দুই পূর্বসূরীর পরস্পর বিরোধী পথের মধ্যে শ্রীরাম এক আশ্চর্য সমন্বয় সাধন করেন। কার্তবীর্যাজুন স্বার্থপর

সংগঠন গড়েন। পরশুরাম নিঃস্বার্থ সংগঠন গড়েন। কোনো সংগঠন স্থায়ী হয়নি। শ্রীরাম যে সংগঠন গড়ে তোলেন তা এই পশুত্ব ও দেবত্বের (কার্তবীর্যার্জুন ও পরশুরাম) সমন্বয়ে গ'ড়ে উঠেছিল। বস্তুতঃ মানুষ পশু ও দেবতার মিশ্রণে তৈরী। পশুত্বেরঅংশ কমিয়ে দেবত্বের অংশ বৃদ্ধি করাই মনুষ্যত্ব। এই ধৈর্যশীল প্রযত্ন পরশুরামের পক্ষে সম্ভব হয়নি। কিন্তু শ্রীরামের পক্ষে হয়েছিল। এই সাফল্যের চাবিকাঠি ছিল তাঁর স্বদেশ প্রীতির মধ্যে। শ্রীরামের সংগঠনের মূল আধার ছিল দেশপ্রেম। সম্পূর্ণ সমাজ এক পুরুষ, আমরা তাঁর অবয়ব—এই ছিল সেই সংগঠনের মূল কথা। সেখানে উচ্চ-নীচ ভেদাভেদ ছিল না। সমাজ জীবনে বিলীন হওয়াই ছিল প্রত্যেকের জীবনের সাফল্য। সংগঠনের জন্য ন্যায় ও স্থায়ী আদর্শের কথা তিনি ভেবেছিলেন। তাই সর্বযুগের শ্রেষ্ঠ সংগঠক হিসেবে তিনি নমস্য। ভারতের রাষ্ট্র জীবনকে তিনি পূর্ণতা দান করেছেন। জগতের সামনে আদর্শ পথ দেখিয়েছেন। তাই তিনি ভারতবাসীর নয়নমণি।

শ্রীকৃষ্ণ অবতার ঃ সমাজ পুরুষের অস্ত্রোপচার

ভগবান বিষ্ণুর অষ্টম অবতার শ্রীকৃষ্ণ। বৈষ্ণবদের মতে শ্রীকৃষ্ণ অবতার নন, পরম ব্রহ্ম। যাহোক অবতার পরম্পরা লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে, নরসিংহ অবতারথেকে রামাবতার পর্যন্ত ভারতীয় জাতীয়তাবোধ ক্রমশঃ বিকাশলাভ করেছে এবং রামচন্দ্রের সময় তা আসমুদ্র হিমাচল ভারতবাসীর মনে গেঁথে গেছে। রামচন্দ্রের জাতীয়তাবাদের চরম কথাটি ছিল—জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী। আরও একটি মহৎ কর্মের জন্য রামচন্দ্র চিরস্মরণীয়। তা হ'ল রামরাজ্য স্থাপন; অর্থাৎ আদর্শ রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা। এই সময়ে আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ সম্পন্ন হয়েছিল—শিক্ষা ও সংস্কারের মাধ্যমে জাতীয়তাবোধ সম্পন্ন ব্যক্তি নির্মাণ। বিষয়টি উপলব্ধ হলেও সম্পন্ন করার অবসর রামচন্দ্র পাননি অন্তিম জীবনের হতাশা ও অকস্মাৎ মৃত্যুর জন্য।

রামচন্দ্রের মৃত্যুর পর রামরাজ্যও বিনষ্ট হয়। রামচন্দ্রের উত্তরাধিকারীগণ যে কেমন ছিলেন, তা কালিদাসের রঘুবংশ কাব্য পাঠে জানা যায়। ইন্দ্রিয়পরবশ, স্বার্থপর ভোগাসক্ত রাজারা প্রজাশাসনে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হন। রামচন্দ্র থেকে শ্রীকৃষ্ণ পর্যন্ত ভারতে কোনো রাজচক্রবর্তী সম্রাট আবির্ভূত হননি। রাজা বলতে তখন কংস, জরাসন্ধ, শিশুপাল প্রভৃতি নরপশু। এইসব রাজারা প্রজাপীড়ন ব্যতীত আর কিছু জানতো না। এই সময়ের সমাজের আর একটি সুন্দর চিত্র আমরা পাই বকাসুরের কাহিনীতে। বকাসুর ও তার গুটিকতক অনুচর সেই সময় নগরে নগরে অবর্ণনীয় অত্যাচার করে বেড়াত। দেশের মানুষ এই অত্যাচার প্রতিহত করার কথা কল্পনাও করেনি। বরং তারা এই অসুরের নিত্য আহর্যের ব্যবস্থা করেছিল। আর আহার্য ছিল—এক গোরুর গাড়ি ভর্তি ভাত, দুটি মহিষ ও একটি মানুষ। সেই সময়ে সমাজে এমন অবস্থা যে, এই অত্যাচার অবাধে দীর্ঘকাল চলেছিল। ভীমসেন বকাসুর বধ করে দেশকে রক্ষা করেন।

শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাবের আগে পর্যন্ত দেশের এমনই পরিস্থিতি ছিল। এই অন্যায়, অবিচার ও অত্যাচারের প্রতিকার করার জন্য তিনি অবতীর্ণ হন। বাল্যকাল থেকেই তিনি তাঁর কাজ শুরু করেন—পুতনা বধ, অঘবধ, কালীয়াদমন, গোবর্ধন উত্তোলন প্রভৃতি নানা কার্যের মাধ্যমে তিনি সাধারণ মানুষকে শক্তি দিয়েছিলেন। পরে কংস বধও তিনি সম্পন্ন করেন। কিন্তু তখনও নিজ কর্তব্য স্থির করেননি। মহর্ষি সন্দীপনের আশ্রমে শিক্ষা গ্রহণের সময় দেশের ও জাতির

অবস্থা গভীরভাবে বিশ্লেষণের পর তিনি পরবর্তী কর্তব্য কর্ম স্থির করেন। পরশুরামের ইতিহাস থেকে শিক্ষা নিয়ে তিনি ক্ষত্রিয়দের মধ্যে কর্তব্যবোধ জাগ্রত করতে যথাশক্তি চেষ্টা করেন।

শ্রীকৃষ্ণ সমাজে একটি নূতন নীতি প্রবর্তন করেন। তাহ'ল সমগ্র ক্ষত্রিয় সমাজ কখনও মন্দ হয় না; একটি সীমা পর্যন্ত ক্ষত্রিয়দের সংশোধনের চেষ্টা করা উচিত। তাই তিনি শিশুপালের শত অপরাধ ক্ষমতা করেছিলেন। কিন্তু তারপরও যখন তার পরিবর্তন হ'ল না, তখন শ্রীকৃষ্ণ তাকে বধ করতে কুণ্ঠাবোধ করেননি। কংস ও জরাসন্ধের ক্ষেত্রেও তিনি একই নীতি গ্রহণ করেন। এই সময় শ্রীকৃষ্ণের নেতৃত্বাধীন কোনো কোনো ক্ষত্রিয় যুদ্ধে লোকক্ষয়ের কথা চিন্তা ক'রে বহু অপমান সহ্য করেছিলেন। তাদের মধ্যে পাণ্ডবরা অন্যতম। পাণ্ডবরা অনায়াসে অনেক আগেই কৌরবদের দফা রফা করে দিতে পারতেন। কিন্তু তাঁরা কৌরবদের বোধোদয় ঘটাবার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু দুর্যোধনের জেদের জন্য সব চেষ্টা ব্যর্থ হয়। দুর্যোধনের এই জেদের ব্যাখ্যা তিনি নিজেই এক জায়গায় দিয়েছেন—

'জানামি ধর্মং ন চ মে প্রবৃত্তিঃ জানাম্যধর্মং ন চ মে নিবৃত্তিঃ।
কেনাপি দেবেন হৃদিস্থিতেন যথা নিযুক্তোস্মি তথা করোমি।।"

—ধর্ম কী, তা আমি জানি, কিন্তু তাতে আমার প্রবৃত্তি ছিল না; অধর্ম কী তাও আমি জানি, কিন্তু তা থেকে নিবৃত্ত হতে পারিনি। অন্তরস্থিত কোনো এক দেবতা দ্বারা যে কার্যে নিযুক্ত হতাম, সেই কার্য করতাম। এই অন্তরস্থিত দেবতা কে? এটিই কালপ্রবাহে বহমান সংস্কৃতি। অর্থাৎ পূর্ব জন্মের সংস্কার-প্রারব্ধ। কোনো ব্যক্তি নিজ ইচ্ছায় বিশেষ কিছু করতে পারে না। ব্যক্তি তো সমাজ প্রবাহে এক বুদ্বুদের মতো। পিছনের জলরাশি তাকে সামনে ঠেলে দেয় আর সামনের পথ আগের জল-প্রবাহে পূর্ব থেকেই সৃষ্ট থাকে। সমগ্র সমাজে যে সংস্কার দৃঢ় হয়ে রয়েছে তার সামনে ব্যক্তি নিরুপায়, অসহায়। এই সংস্কারের মধ্য দিয়ে যে প্রবৃত্তি তৈরী হয়, ব্যক্তি সেই মতো কাজ করে। একেই আমরা দৈব, ভাগ্য, নিয়তি বলি। আসলে ব্যক্তি সমাজ আশ্রিত। সমাজরীতি ব্যতীত ব্যক্তি কিছু করতে পারে না। একথা শুধু দুর্যোধনের ক্ষেত্রে নয়; ভীষ্ম, দ্রোণ, সকলের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। কালপ্রবাহের বিপরীতে গিয়ে নিজের চোখে দেখা অন্যায় অত্যাচারের প্রতিবিধান তাঁরাও করতে পারেননি। দৌপদীর বস্ত্রহরণ প্রকাশ্য দিবালোকে রাজসভায় সকলের উপস্থিতিতেই ঘটেছিল।

শ্রীকৃষ্ণ দুষ্টদের সংশোধনের সুযোগ দিয়েছিলেন, কিন্তু তারা সংশোধিত হয়নি। কারণ কালপ্রবাহে বহমান সংস্কৃতি অর্থাৎ নিয়তি তাদের বাধা দিয়েছিল। মানুষ সংস্কার অনুযায়ী কার্য করে। একবার অন্যায়ভাবে পেলে ন্যায় পথে ফিরে আসতে পারে না। এই অবস্থায় তাদের বিনাশ ব্যতীত গত্যন্তর নেই। এটি এই যুগের একটি মান্য সিদ্ধান্ত। এই যুগে সমাজপতিরা অনুভব করেছিলেন, জন্ম থেকেই ব্যক্তির মধ্যে রাষ্ট্রনিষ্ঠা ও দেশপ্রেমের শিক্ষা থাকা প্রয়োজন। শ্রীকৃষ্ণ বেদব্যাস, ভীষ্ম, বিদুর সকলেই সমাজ সংস্কারের অনুকূল সময়ের প্রতীক্ষা করছিলেন। কিন্তু ভাঙা বাড়ি অপসারণ না ক'রে যেমন সেখানে নতুন বাড়ি নির্মাণ

করা যায় না, তেমনি সমাজে দুষ্টের বিনাশ ব্যতীত শিষ্টের পালনও করা যায় না। দুষ্টেরা থাকলে সমাজে নতুন প্রজন্মের লোকেদের সুশিক্ষা দেওয়া সম্ভব হয় না। আলুর বস্তায় একটি পচা আলু থাকলে, সর্বাগ্রে তাকে ফেলে দিতে হয়; নচেৎ সমস্ত আলু পচে যায়। দেহে ক্যান্সার হ'লে অস্ত্রোপচারের ভয় করলে চলে না।

মানবদেহের মতো সমাজদেহ সম্পর্কেও একই কথা। শ্রীকৃষ্ণের সময় অর্থাৎ মহাভারতের যুগে সমাজদেহে অস্ত্রোপচার কালপ্রবাহেই নিয়তি নির্দিষ্ট হয়ে উঠেছিল। কে তাকে নিবারণ করবে? মাতা কুন্তী কর্ণকে বোঝাতে পেরেছিলেন। তাই বলেছিলেন— 'ভাবী বিনাশ কেউ রোধ করতে পারবে না। পাণ্ডবরা বিজয়ী হবে। কৌরবরা বিনষ্ট হবে। অগণিত ক্ষত্রিয় নিহত হবে। কিন্তু কালপ্রবাহ থামবে না। এর বিপরীত হলে আরও বিপত্তি হবে। দুষ্টদের সমাজ থেকে উৎপাটিত করা উচিত। একথা সত্য, নূতন যুগের উত্থানের জন্য এই বলিদান প্রয়োজন। আসন্ন সংস্কার পর্ব দুঃখজনক হলেও আপন কর্তব্য পথ চিনে সমাজের ভাবী কল্যাণের কথা ভেবে আমরা সহর্ষে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করবো।' যুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী—একথা নিশ্চিত হওয়ার পর ক্ষত্রিয়দের কর্তব্য স্পষ্ট হয়ে গেল। শ্রীকৃষ্ণ গীতার সাহায্যে অর্জুনকে এই কথাই বলেছিলেন। এখন ক্ষত্রিয় ধর্ম পালনের সময়; নিজ কর্তব্য পালন পরম ধর্ম। মোহাবিষ্ট অর্জুনকে তিনি বোঝালেন, তোমার সামনে দাঁড়িয়ে থাকা এই যোদ্ধাদের মৃত্যুতেই সমাজের কল্যাণ। তাই কর্মফলের চিন্তা না করে কর্ম করো। ভারতযুদ্ধে অসংখ্য ক্ষত্রিয় নিধন হ'ল, ভালো মন্দ সকলেই মরলো। সমাজ দুর্বল হয়ে পড়ল। এই সামাজিক দুর্বলতা দীর্ঘকালব্যাপী ছিল। সমস্ত দেশ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত হয়ে গেল। কোথাও প্রজাতন্ত্রী রাজ্য গড়ে উঠল। ব্যক্তিবাদ, প্রাদেশিকিতা, গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব প্রবল হ'য়ে উঠল। এইরকম সামাজিক বাতাবরণে ব্যাপক রাষ্ট্র ভাবনার চেতনা লুপ্ত হ'ল। স্বর্গলাভের জন্য যাগযজ্ঞের আয়োজন বেড়ে গেল। প্রাচীনকালের যজ্ঞের সুসংস্কৃত রূপটি নষ্ট হ'ল। সকলেই আগুনে ঘি ঢেলে যজ্ঞ করতে শুরু করল। ফলে যজ্ঞের সমাজহিত ও যথার্থতা নষ্ট হল। পূজা সংহতি রক্ষা দান ইত্যাদি বিশেষ জিনিসগুলি অপ্রয়োজনীয় নিষ্ফল হয়ে গেল। এই সব জিনিসের তাৎপর্য ও চরিতার্থতা সমাজ বিস্মৃত হ'ল। এইভাবে বৈদিক যজ্ঞের অবনতি ঘটল। এমনই এক সামাজিক ও বৈদিক অরাজকতার বিচিত্র আবহে—কালান্তর পর্বে ভগবান বুদ্ধের আবির্ভাব। তিনি সমাজে নূতন চিন্তাধারার স্রোত প্রবাহিত করেন। ভারতবর্ষ আবার জেগে ওঠে। তিনি অবতার। কারণ অবতারের কাজ সকল-প্রকার পঙ্কিলতা থেকে সমাজকে উদ্ধার করা।

বুদ্ধাবতার ঃ আধুনিক জাতীয়তাবোধের উন্মেষ

ভগবান বিষ্ণুর নবম অবতার বুদ্ধদেব। মহাভারতের যুদ্ধে প্রায় সমস্ত ক্ষত্রিয় বিনষ্ট হল। সমাজ দুর্বল হয়ে পড়ল। সমস্ত দেশ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত হয়ে গেল। ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যবাদ, প্রাদেশিকতা, গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব মাথাচাড়া দিল। একক রাষ্ট্রচেতনা লুপ্ত হল। ধর্মেও অবনতি দেখা দিল। প্রাচীনকালের যজ্ঞের সুসংহত রূপটি নষ্ট হয়ে শুধু স্বর্গলাভের জন্য আগুনের ঘি ঢালা শুরু হ'ল। সকলে মন্ত্র পড়ে আগুনে ঘি ঢেলে ভাবলো যজ্ঞ করছে। পূজা-দান-প্রভৃতি যজ্ঞের প্রধান অঙ্গগুলি গুরুত্ব হারিয়ে কেবল পশু মাংসের লোভে পশুযাগ ব্যাপকভাবে শুরু হ'ল। এইভাবে বৈদিক যজ্ঞের অবনতি ঘটল। এমন এক বৌদ্ধিক ও সামাজিক অরাজক পরিস্থিতিতে ভগবান বুদ্ধ আবির্ভূত হলেন। তাঁর নতুন চিন্তাধারায় ভারতবর্ষ আবার জেগে উঠল।

বুদ্ধদেবের আবির্ভাবকালে মানুষ তার কর্তব্য বিস্মৃত হয়েছিল। বুদ্ধদেব সেই কর্তব্য কর্ম চেতনা জাগিয়ে মানুষের দুঃখ দারিদ্র্য দূর করার চেষ্টা করেছিলেন। যাগযজ্ঞের নিষ্প্রাণ কর্মকাণ্ডে নিহিত হিংসার পরিবর্তে কর্মের সাত্ত্বিক আনন্দের কথা তিনি প্রচার করেন। তাঁর লক্ষ্য সহজ-সরল ও একমুখী ছিল। বেদে যাগযজ্ঞের কথা আছে বলেই তিনি বেদবিরোধী হয়ে উঠেছিলেন। কিন্তু বেদ-বেদান্ত ব্যক্তি ও সমষ্টির কল্যাণ চিন্তার প্রেরণা দেয়। বুদ্ধদেব বোধ হয় বেদের এই কল্যাণকর দিকটির প্রতি লক্ষ্য দেননি। ভারতীয় মানসে বেদের স্থান অতি উচ্চে। বেদের অনাদরের সঙ্গে সঙ্গে সমাজ-তরণীও টলমল করতে লাগল। বুদ্ধদেব পূর্ব-পরম্পরার কেবল বিরোধিতা করেননি; তা পালন করতে নিষেধও করেন। তিনি তাঁর অনুগামীদের সমাজ থেকে স্বতন্ত্র করার জন্য পৃথকভাবে তাদের সংগঠিত করেন। তিনি তাঁর মতবাদ প্রচার করার জন্য সুব্যবস্থা করেন। তাঁর মতবাদ সাধারণের মধ্যে বেশ প্রচার লাভ করে। বিশ্বে বুদ্ধই প্রথম ধর্ম প্রচারক। তাঁর অনুগামীরা ধর্ম প্রচারকেই জীবনের শ্রেষ্ঠ কাজ মনে করতেন। ফলে বৌদ্ধধর্ম ভারতে ও বহির্ভারতে দ্রুত বিস্তারলাভ করে। বৌদ্ধধর্ম বিস্তারলাভ করলেও আচার-ব্যবহারে কোনো পার্থক্য দেখা গেল না। বুদ্ধের পূর্ববর্তী লোকেরা ব্যক্তিগত মোক্ষলাভের আশায় সহিংস যজ্ঞ করতো আর বুদ্ধের অনুগামীরা নিজ নির্বাণের জন্য বুদ্ধবাণী প্রচার করতো। সমগ্র সমাজের কথা ভাববার জন্য কেউ রইল না। সমাজের

জন্য সমষ্টি জীবনকে পুনর্জীবিত করার, জাতীয় কল্যাণের জন্য জাতীয় জীবনের সর্বাঙ্গীণ উন্নতির প্রচেষ্টা বৌদ্ধদের মধ্যে দেখা যায়নি।

ভগবান বুদ্ধ সাধন সম্বন্ধে বৈরাগ্যবান ছিলেন। তাঁর হৃদয় বিশাল ছিল। জাতীয়তাবোধ তাই তাঁর কাছে ছিল তুচ্ছ। আপন হৃদয়ের বিশালতার জন্য তিনি সমাজের বাস্তব অবস্থানটি লক্ষ্য করেননি। তিনি সকলকেই নিজের মতো মহান ভাবতেন। তাই ব্যক্তি বিকাশের কোনো ব্যবস্থা না করেই সকলের জন্য এক প্রব্রজ্যার বিধান দেন। ফলে তাঁর পরিনির্বাণের কিছুকাল পরেই বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের মধ্যে নীতিহীনতা দেখা দিল। এক দিকে সমাজ নিরপেক্ষ সম্প্রদায় নিষ্ঠ জীবন, অন্যদিকে বৌদ্ধ বিহারের ক্রমবর্ধমান দুর্নীতি—এই দুয়ের সম্মিলনে সমগ্র সমাজের মধ্যে অবনতির আশঙ্কা দেখা দিল। একদিকে পূর্ববর্তী ঐতিহ্য পরিত্যাগ ও অন্যদিকে সমাজের ক্রমবিকাশের কোনো ব্যবস্থা না করা—এই দুইয়ের ফলে অবস্থা এই রকম দাঁড়াল যে সমাজ দুর্বল হয়ে পড়ল। রাজনৈতিক জীবনে এর পরিণতি ভয়াবহ হল। ভারতে বৈদেশিক আক্রমণ শুরু হ'ল। ব্যাকট্রিয় যবন সম্রাট দিনেত্র ভারতবর্ষ আক্রমণ করলেন। কলিঙ্গ সম্রাট খারবেল তাকে প্রতিহত করেন। সেই সময় বৌদ্ধরা 'অহিংসা পরমঃ ধর্মঃ' ব'লে বিদেশী আক্রমণ প্রতিরোধের বিরোধিতা করেন। ফলে সারা দেশে বৌদ্ধমতের বিরুদ্ধে জনচিত্তে প্রবল আলোড়ন সৃষ্টি হ'ল। বৌদ্ধমত লোকসমাজে নষ্ট প্রায় হয়ে গেল। বৌদ্ধমত এতদূর প্রসার লাভ করেছিল যে, ভারতবর্ষ আক্রমণকারী বিদেশীরা দেশীয় লোকেদের প্রতিরোধ শিথিল করার জন্য নিজেরাই বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করতো। কুষাণ সম্রাটরা এই জন্যই বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করেন। এইভাবে ভারতবর্ষ বুদ্ধদেবের উপদেশ সঠিকভাবে গ্রহণ করতে না পারায় ধীরে ধীরে দেশকে দুর্বল থেকে দুর্বলতর করে তুলল। ফলতঃ পরবর্তী বিদেশী আক্রমণের ক্ষেত্র প্রস্তুত হতে লাগল লোকচক্ষুর অন্তরালে।

এই পরিস্থিতি পরিবর্তনের জন্য বৈদিক ধর্মের পুনরুত্থান দেখা দিল। সমাজে প্রাচীন জাতীয়তাবোধের ঐতিহ্য জাতীয়জীবনে সংস্কার শুরু হল। এই মহান কার্যে যাঁরা অগ্রগামী ছিলেন, তাঁরা হলেন—চাণক্য, চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য, সম্রাট বিক্রমাদিত্য, সম্রাট শালিবাহন, দশাশ্বমেধ যজ্ঞকারী সম্রাট ভারশিব, সম্রাট সমুদ্রগুপ্ত, চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্য, সম্রাট হর্ষবর্ধন, সম্রাট পুলকেশী, সম্রাট রাজেন্দ্র চোল প্রভৃতি। এই সব রাজাদের কঠোর পরিশ্রমের ফলে শক, হূণ, প্রভৃতি বিদেশী আক্রমণ প্রতিহত করা সম্ভব হয়েছিল। এই সময় বৌদ্ধদের দ্বারা অবদমিত জাতীয়তাবোধ পুনর্জাগরিত হয়ে উঠল। ভারতবর্ষ আবার বৈভবশালী দেশে পরিণত হল। আর উন্নতির চরম শিখর স্পর্শ করল। এই সময়েই ভারতের কীর্তি বিশ্বব্যাপী বিস্তার লাভ করেছিল। তাই দেশী-বিদেশী ইতিহাসবিদ্‌রা এই কালপর্বকে 'ভারতের সুবর্ণযুগ' বলেন।

মহামতি চাণক্য এই প্রবল পুরুষার্থ সম্পন্ন বৈভব পরম্পরার সূচনা করেন। আর শ্রীমৎ আদি শঙ্করাচার্য তা সম্পূর্ণ করেন। পুরুষার্থ কথার অর্থ—ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ—ব্যক্তি ও সমাজজীবনে এই চারমার্গে জীবন সুসম্পন্ন করাকে পুরুষার্থ বলে। এখানে পুরুষ মানে Male নয়, Human being—নারী- পুরুষ উভয়েই। ধর্মার্থকামমোক্ষের মাধ্যমে ভারসাম্যময়

সমাজজীবনের বিকাশ সাধনই ভারতের সমাজ ধর্মের মূলকথা। এই সময়ে প্রতিটি মানুষকে আশৈশব সৎ-সংস্কার দেওয়ার সামাজিক প্রথা প্রচলিত হয়। স্বদেশ ও সমাজকে দেখার জন্য, জানার জন্য চারতীর্থ ধাম ভ্রমণের রীতি শুরু হয়। প্রাচীন ইতিহাস পুনর্লিখিত হয়। সকল ভারতবাসীর মন থেকে প্রাদেশিকতা, সাম্প্রদায়িকতা দূর ক'রে অখিল ভারতীয় চেতনা বিকাশের জন্য সর্বভারতীয় ভাষা সংস্কৃত পুনর্জীবিত হয়। এই সময়েই ভারত প্রকৃত মহাভারত হয়ে ওঠে। অর্থ শাস্ত্র, মনুস্মৃতি, পুরাণ এই সময় রচিত হয় এবং সূত-চারণদের মাধ্যমে প্রচারিত হয়। এইভাবে তত্ত্বে ও প্রয়োগে রাষ্ট্রভাবনা দেখা দেয়। তীর্থযাত্রা, উৎসবাদির মাধ্যমে জাতীয়তাবোধ, একাত্মতাবোধ মানবমনে স্থায়ী আসন লাভ করে। পঞ্চমবেদ মহাভারতে ভারতের অখণ্ডতা ও সামাজিক কর্তব্য বিষয়ে বিশেষ আলোচনা দেখা যায়।

এই যুগের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বাণী হ'ল লোক সংস্কারের মাধ্যমে সমাজহিত সাধন। সমাজের সমস্ত মানুষকে কাম্য লোক সংস্কারের পথনির্দেশ দেবার জন্য সমস্ত দেশব্যাপী বিচরণশীল নিঃস্বার্থ সন্ন্যাসী সম্প্রদায় সৃষ্টি। এই সম্প্রদায় দশনামী সম্প্রদায় নামে খ্যাত। এদের মধ্যে যাঁরা তীর্থে ঘুরে লোক-সংস্কার করতেন তাঁরা 'তীর্থ'। যাঁরা মঠে বা আশ্রমে বসে এই কাজ করতেন তাঁরা 'আশ্রম'; যাঁরা বনবাসীদের সংস্কার করতেন তাঁরা 'বন' অরণ্য; পর্বতে যাঁরা সংস্কার দিতেন তাঁরা 'পর্বত' গিরি; সাগরতটে যাঁরা লোকসংস্কার করতেন তাঁরা 'সাগর'; নগরীতে যাঁরা উপদেশ দিতেন তাঁরা 'পুরী'। সারস্বদ্বর্গের সঙ্গে যাঁরা ধর্ম সংস্কার নিয়ে আলোচনা করতেন তাঁরা 'সরস্বতী'। সমস্ত ভারতবর্ষ ঘুরে যাঁরা ধর্ম ও জাতীয়তাবাদের প্রচার করতেন তাঁরা 'ভারতী'।

দশনামী সম্প্রদায়ের সন্ন্যাসীদের কার্যকলাপের মধ্য দিয়ে ধর্ম ও জাতীয়তাবোধ মানবমনে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হয়. সেকালের কঠিন পরিস্থিতির মধ্যে এই ধরণের পরিকল্পনা সফল করতে একদল স্থায়ী শিক্ষকের প্রয়োজন হয়েছিল। এই শিক্ষকদের ভরণ পোষণের জন্য রাজা ভূমি দান করতেন। এই যুগেই ব্রাহ্মণ ব্যতীত অন্যবর্ণের লোকও সন্ন্যাস আশ্রমের মাধ্যমে সমাজ-গুরুর আসনে বসেছিল। ব্রাহ্মণ-অব্রাহ্মণ সকল সন্ন্যাসী গৈরিক বসন পরতেন। সমাজে গৈরিক বসন ধারীর অত্যন্ত সম্মান ছিল। তাঁরা সমাজের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি বলে গণ্য হতেন। ভগবান বুদ্ধের প্রচারতন্ত্রের ত্রুটিগুলি সংশোধন ক'রে শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য হিন্দুধর্ম ও ভারতীয় জাতীয়তাবোধের পুনঃপ্রতিষ্ঠাকরেন। ফলে ভারতীয় সমাজ ভগবান বুদ্ধ ও আচার্য শঙ্করের মিলিত শ্রমের ফলশ্রুতি। বুদ্ধের উদারতা ও কর্মপ্রেরণা এবং শঙ্করের প্রখর বুদ্ধিমত্তা ও দার্শনিক চিন্তার মিলিত রূপ বর্তমান হিন্দুসমাজ ও ভারতবর্ষ। বুদ্ধদেব ও শঙ্করাচার্যের মধ্যে কোনো বিরোধ নেই—বরং একে অপরের পরিপূরক।

ভগবান বিষ্ণুর দশ অবতারের মধ্যে নবম অবতার হিসেবে বুদ্ধদেবকে স্বীকার করার রহস্য এছাড়া আর কি-বা হতে পারে!

কল্কি অবতার ঃ নবযুগের সূচনা

ভগবান বিষ্ণুর দশম বা শেষ অবতার কল্কি। আমরা জানি বর্তমান কলিযুগের অবসানে বিষ্ণু কল্কিরূপে জন্মগ্রহণ করে কলিকে বিনাশ করবেন। তারপর আবার সত্যযুগের আবির্ভাব হবে। কল্কির রূপবর্ণনায় বলা হয়েছে—দুই পক্ষযুক্ত শ্বেত অশ্বে আরোহণ করে জ্বলন্ত ধূমকেতুর ন্যায় এক হাতে তলোয়ার অন্য হাতে চক্র নিয়ে তিনি আবির্ভূত হবেন। কলি শেষে পৃথিবী ম্লেচ্ছ পূর্ণ হবে, সমস্ত মানুষ এক হবে, ধরণী পাপে পরিপূর্ণ হবে। তখন ভগবান বিষ্ণু কল্কি অবতাররূপে আবির্ভূত হয়ে পৃথিবী রক্ষা করবেন। কল্কির আবির্ভাবের স্থানও শাস্ত্রে বলা হয়েছে—শম্ভল গ্রামনিবাসী বিষ্ণুযশা নামক পূতচরিত্র ধর্মনিষ্ঠ ব্রাহ্মণের গৃহে সুমতির গর্ভে চৈত্রমাসের শুক্লা দ্বাদশী তিথিতে জন্মগ্রহণ করবেন। তিনি বর্ণাশ্রম ও সৎধর্ম স্থাপনের জন্য কলিকে বিনাশ করে ম্লেচ্ছকুল ও বিধর্মীদের নির্মূল করে সত্যযুগ প্রতিষ্ঠা করবেন। তিনি বর্ণাশ্রম ধর্ম স্থাপন করবেন। সমস্ত পৃথিবী জয় করে অশ্বমেধযজ্ঞ করবেন। সেই যজ্ঞের দক্ষিণা স্বরূপ তিনি সমস্ত পৃথিবী ব্রাহ্মণদের দান করবেন। সহস্র সহস্র ব্রাহ্মণ কল্কির পক্ষে অস্ত্রধারণ ক'রে ম্লেচ্ছ নিধন করবেন। ম্লেচ্ছ নিধনের পর পুনরায় সত্যযুগ প্রতিষ্ঠা ক'রে তিনি অন্তর্হিত হবেন।

কলিযুগের শেষে কলিকে বিনাশ করে কল্কি অবতার পুনরায় সত্যযুগ স্থাপন করবেন। কলিযুগ ব্যাপারটি কি? হিন্দুরা মহাকালকে চারিটি যুগে ভাগ করেছেন—সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর কলি। এই চারিযুগের অন্তিম যুগ কলি। কলি এ যুগের অধিষ্ঠাতা বলে এর এইরূপ নামকরণ হয়েছে। ১২০০ দিব্যবৎসর অর্থাৎ ১২০০×৩৬০ = ৪,৩২,০০০ বৎসর এই যুগের পরিমাণ। হিন্দু কালগণনায় বৎসরের পরবর্তী বড় একক হ'ল যুগ। যুগ কথার অর্থ সংযোগ। আকাশে একাধিক গ্রহ-নক্ষত্র-একটি সরলরেখায় অবস্থান করলে তাকে সংযোগ বলে। সুতরাং যুগগণনার সঙ্গে গ্রহ-নক্ষত্রের মিলন বা সংযোগ আছে। হিন্দু জ্যোতিষ মতে, ১৯৭ কোটি বৎসর পূর্বে (বর্তমান শ্বেতবরাহ কল্পের আরম্ভে) আকাশের সমস্ত গ্রহ মেষ রাশির অন্তর্গত অশ্বিনী নক্ষত্রে মিলিত হয়েছিল। ৪৩,২০,০০০ বৎসর পর পর এই ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটে। এইরূপ দুই মহামিলনের মধ্যবর্তী সময়ে আরও নয়বার গ্রহদের মিলন ঘটে। এগুলি গৌণ মিলন। সুতরাং ৪৩,২০,০০০ বৎসরে একটি মহামিলন ও নয়টি গৌণমিলন, মোট দশটি মিলন ঘটে। এই

মিলনগুলি ৪৩,২০,০০০ বৎসরের ঠিক এক দশমাংশ বা ৪,৩২,০০০ বৎসর অন্তর সংঘটিত হয়। এই একবার মিলনের সময় বা ৪,৩২,০০০ বৎসর কলিযুগ। দুইবার মিলনের সময় অর্থাৎ ৮,৬৪,০০০ বৎসর দ্বাপর যুগ। তিনবার মিলনের সময় ১২,৯৬,০০০ বৎসর ত্রেতা যুগ এবং চারবার মিলনের সময় ১৭, ২৮,০০০বৎসর যাবৎ সত্যযুগ। উপরিউক্ত ১ কলি, ১ দ্বাপর, ১ ত্রেতা ও ১ সত্যযুগ যোগ করলে যোগফল হবে ৪৩,২০,০০০ বৎসর; যেটি কলিযুগের দশগুণ; যার নাম মহাযুগ।

বর্তমানে কলিযুগ চলছে। এই যুগ ৩১০২ খ্রীষ্টপূর্বাব্দের চৈত্রমাসের শুক্লা প্রতিপদের দিন শুরু হয়। এই কলিযুগের উল্লেখযোগ্য ঘটনা কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ। ৭১টি মহাযুগ ও ১ সত্যযুগ মিলে এক মন্বন্তর হয়। প্রতি মহাযুগে একটি কলিযুগ থাকে। সুতরাং অতীতে বহু কলিযুগ ছিল। যাগযজ্ঞ কিংবা পূজার্চনা শুরু করার পূর্বে পুরোহিতগণ একটি সংকল্প মন্ত্র পাঠ করেন। যার মাধ্যমে যজ্ঞ বা পূজার স্থান-কাল যজমানের পরিচয় উল্লেখ করা হয়। সেখানে কাল বা সময়ের উল্লেখ প্রসঙ্গে বলা হয়—"অদ্য ব্রহ্মণো দ্বিতীয় পরার্ধে শ্বেতবারাহকল্পে সপ্তমে বৈবস্বতে মন্বন্তরে অষ্টবিংশতিতমে কলিযুগে কলি প্রথম চরণে একশত ষোড়শাধিকপঞ্চ সহস্র বর্ষে গতাব্দে...." অর্থাৎ বর্তমান সৃষ্টি হবার পর থেকে প্রথম পরার্ধ (ব্রহ্মার আয়ুর প্রথম ৫০ ব্রাহ্ম বৎসর অতিক্রান্ত) পার হয়ে গেছে। বর্তমানে তার অব্যবহিত পরের দিন বা শ্বেতবারাহ কল্প চলছে। এই শ্বেতবারাহ কল্প শুরু হবার পর ছয়টি মন্বন্তর পার হয়ে বর্তমান সপ্তম মন্বন্তর বৈবস্বত মনুর কাল চলছে। এই সপ্তম মনুর কাল শুরু হবার পর ২৭টি মহাযুগ অতিক্রান্ত হয়ে বর্তমানে ২৮ মহাযুগের ১ সত্যযুগ, ১ ত্রেতাযুগ, ১ দ্বাপর যুগ পার হয়ে কলিযুগের ৫১১৬ বৎসর পার করে ৫১১৭ তম বর্ষ চলছে। তাহলে কলিযুগ শেষ হতে এখনও প্রায় ৪,২৭,০০০ বৎসর বাকি। এই সব বৎসর অতিক্রান্ত হলে কল্কি অবতার আবির্ভূত হবেন। তারপর পৃথিবী ধ্বংস হবে এবং নতুন যুগ অর্থাৎ সত্যযুগ শুরু হবে।

কলিযুগের অধিপতি কলি। দ্বাপর যুগের শেষে ব্রহ্মার পৃষ্ঠদেশ থেকে অধর্ম আবির্ভূত হন। অধর্মের স্ত্রী মিথ্যা। তাঁদের পুত্র দম্ভ নিজ ভগিনী মায়াকে বিবাহ করেন। তাঁদের পুত্র লোভ। লোভও নিজ ভগিনীকে বিবাহ করেন। তাঁদের পুত্র ক্রোধ ও কন্যা হিংসা। ক্রোধ আবার ভগিনী হিংসাকে বিবাহ করেন। তাঁদের পুত্র কলি। কলির বামহস্তে পুংচিহ্ন; বর্ণ তৈলাক্ত কজ্জলের ন্যায় উজ্জ্বল। তিনি বিকট বদনা লোলজিহ্ব, পূতিগন্ধময়। মদ্যালয়, বেশ্যালয়, দ্যূতক্রীড়াস্থলে তার অবস্থান। তিনি ভগিনী দুরুক্তিকে বিবাহ করেন। কলিযুগে মিথ্যা-হিংসা-শোক ইত্যাদির প্রাধান্য। কলিতে ধর্মের স্থান মাত্র একপাদ ও অধর্মের স্থান তিন পাদ। এইযুগে মানুষ কামুক, কটুভাষী, জনপদ দস্যুপীড়িত, নারী অল্পভাগ্যা, বহুসন্তানবতী ও পতির অবজ্ঞাকারিণী হবে। এই যুগের অবসানে ভগবান বিষ্ণু কল্কিরূপে অবতীর্ণ হয়ে কলিকে ধ্বংস করবেন।

কল্কি অবতারের কীর্তি হ'ল কলিযুগের ধ্বংসসাধন ও সত্যযুগের পুনঃস্থাপন। এই কীর্তির মধ্যে একটি ঐতিহাসিক সত্য আছে। তা হ'ল পুরাতনের মধ্যেই নতুনের সৃষ্টি। পুরাতন বৎসরের জীর্ণ ক্লান্ত রাত্রির মধ্যেই নূতন প্রভাতের জন্ম। পুরাতন পত্র ঝরিয়ে দিয়েই নতুন পত্রের উদ্‌গম। এই কাজটি যিনি সকলের অলক্ষ্যে অনুষ্ঠান করে চলেছেন, তিনিই মহাকাল—সত্য-শিব-সুন্দর। যুগে যুগে তিনি এই জীব প্রবাহটি সচল রেখেছেন। তিনিই ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর—সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ের অধিপতি। এই তত্ত্বই হিন্দুর শাশ্বত জীবন তত্ত্ব; চলমান ইতিহাস। এই তত্ত্ব ব্যক্তি ও সমষ্টি জীবনে সমাজে প্রযোজ্য। ব্যক্তিজীবনে যেমন শৈশব থেকে বার্ধক্য; জন্ম থেকে জরামৃত্যু; দেশের জীবনেও ঠিক তাই—উত্থান-পতন-উত্থান-পতন। এটিই শাশ্বত সত্য। কালিদাসের 'রঘুবংশ' কাব্যে এই ঐতিহাসিক তত্ত্বটি ফুটে উঠেছে। আমাদের যুগবিন্যাসেও এই ঐতিহাসিক সত্য দেখতে পাই। সত্যযুগে সত্য চতুষ্পাদ আর কলিতে একপাদ মাত্র—উত্থান থেকে পতন।

আরও একটি ঐতিহাসিক সত্য আমাদের যুগবিন্যাসে বিধৃত আছে। সেটি হ'ল উত্থান পতনের চক্রবৎ পরিবর্তন। ব্যক্তি জীবনের মতো সমাজ জীবনেও এই চক্রবৎ পরিবর্তন ঘটে—এটি ইতিহাস চক্র Wheel of History। ভারত ইতিহাসের দিকে লক্ষ্য করুন—স্বর্ণযুগ, অন্ধকার যুগ, স্বর্ণযুগ, অন্ধকার যুগ—এইভাবে ইতিহাস চক্র ঘুরে চলেছে। বিশ্বের সব দেশের ইতিহাস এইভাবে ঘুরে চলেছে। ইতিহাসের গতি সরল নয়, চক্রবৎ। হিন্দু ঐতিহাসিকরা যুগবিন্যাসের মধ্য দিয়ে এই ' Wheel of History' তত্ত্ব প্রথম প্রকাশ করেছেন। তাঁরা আরও একটি আশার বাণী শুনিয়েছেন—সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর, কলি—এই চারিযুগের মধ্যে সত্যযুগের ব্যাপ্তিকাল সর্বাধিক ক্রমান্বয়ে কলিযুগে সবথেকে কম। অর্থাৎ সত্যের প্রতিষ্ঠা দীর্ঘকালীন তুলনায় মিথ্যার প্রতিষ্ঠা স্বল্পকালীন। প্রকৃতিতে আমরা তাই দেখি—দুর্যোগের দিন কম, সূর্যকরোজ্জ্বল সুখময় দিনই বেশি। তাই কলির ব্যাপ্তিকাল স্বল্প, কারণ তা অধর্মের যুগ। অর্থাৎ মানবজীবনে অধর্মের স্থান অল্প, ধর্মের স্থান অধিক। এটি মানবজীবনের এক শাশ্বত সত্য; কারণ সে অমৃতের সন্তান।

কল্কি অবতার তত্ত্বের মধ্য দিয়ে পুরাণকার মুনিঋষিরা এই সত্য প্রচার করেছেন—জগতে অসৎ-এর থেকে সৎ-এর অধিকার বেশি, দুঃখের থেকে সুখ বেশি, অন্ধকারের থেকে আলো বেশি। সুতরাং মাভৈঃ ধর্মপথে থাকো। ধর্মকে রক্ষা করো। ধর্মই তোমাকে রক্ষা করবেন—'ধর্মঃ রক্ষতি রক্ষিতঃ' মানব ইতিহাসেরএটিই একমাত্র পুণ্যবাণী।

শ্রীমৎ শঙ্করাচার্যকৃত দশাবতার স্তোত্র

চলল্লোলকল্লোলকল্লা লিনীন স্ফুরন্নক্রচক্রাতিবক্ত্রাম্বুলীনঃ।

হ্নতো যেন মীনাবতারেণ শঙ্খঃ সপায়াদপায়াজ্জগদ্‌বাসুদেবঃ।। ১ ।।

ধরা নির্জরারাতিভারাদপারাদকূপারনীরাতুরাধঃপতন্তী।

ধৃতা কূর্মরূপেন পৃষ্ঠোপরিষ্টাৎ স দেবো মুদে বোহস্তু শেষাঙ্গশায়ী।।২।।

উদগ্রেরদাগ্রে সগোত্রাপি গোত্রাস্থিতা তস্থুষঃ কেতকাগ্রে ষড়ঙ্ঘ্রে।

তনোতিশ্রিয়ংস শ্রিয়ং নস্তনোতু প্রভুঃ শ্রীবরাহাবতারো মুরারি।।৩ ।।

উরোদার আরম্ভ সংরম্ভিণৌ যো রমাসম্ভ্রমাভঙ্গুরাগ্রৈর্নখাগ্রৈঃ।

স্বভক্তাতিভক্ত্যাবিভক্ত্যা সদারুণ্যঘৌঘং সদা বঃ স হিংস্যান্নৃসিংহঃ।। ৪ ।।

ছলাদাকলস্য ত্রিলোকীং বলীনাং বলিং যো ববন্দ ত্রিলোকীঃ বলীনাম্।

তনুত্বং দধানাং তনু সন্দধানো বিমোহং মনো বামনো বঃ স মৃজ্যাৎ।। ৫ ।।

হতক্ষত্রিয়াসৃক্ প্রপান প্রমত্ত প্রনৃত্যৎ-পিশাচ প্রগীত প্রতাপঃ।।

ধরাকারি যেনাগ্রজন্মাগ্রহারং, বিহারং ক্রিয়ান্মানসে বঃ স রামঃ।। ৬ ।।

নতগ্রীব-সুগ্রীব সাম্রাজ্য হেতুর্দশগ্রীব সন্তান সংহারকেতুঃ।

ধনুর্যেন ভগ্নং মহৎ কামহস্তঃ স মে জানকীজানিরেনাংসি হন্তু।। ৭ ।।

ঘনাদ্ গোধনং যেন গোবর্ধনেন ব্যরক্ষি প্রতাপেন গো-বর্ধনেন।

হতারাতিচক্রী রণধ্বস্তচক্রী, পদধ্বস্তী চক্রী স নঃ পাতু চক্রী।। ৮।।

ধরা বদ্ধ পদ্মাসনস্থাঙ্ঘ্রি যষ্টি নিয়ম্যানিলং ন্যস্তনাসাগ্রদৃষ্টিঃ।

য আস্তে কলৌ যোগিনাং চক্রবর্তী স বুদ্ধঃ প্রবুদ্ধোহস্তুনশ্চিত্তবর্তী।। ৯।।

দুরাচার সংসার সংহারকারী- ভবত্যশ্বচারঃ কৃপাণ প্রহারী।

মুরারির্দশা কারধারী হ্যকল্কী, করোতু দ্বিধাং ধ্বংসনং বঃ স কল্কী।। ১০ ।।

অনুবাদ—

- যিনি মৎস্যরূপে অবতীর্ণ হয়ে উত্তুঙ্গতরঙ্গমালা সঙ্কুল মকর কুম্ভীরাদি জল চর সমূহের মুখ্যব্যাদান যুক্ত সমুদ্রজল মধ্যে প্রবেশ পূর্বক শঙ্খাসুরকে সংহার করেছিলেন, সেই বসুদেবনন্দন এই জগৎকে বিপদ থেকে রক্ষা করুন।। ১।।
- বসুমতী অসুরগণের ভারে আক্রান্ত হ'য়ে সাগরজল প্লাবনে অধোগামিনী হ'লে, যিনি কূর্মরূপ পরিগ্রহ ক'রে সেই ধরণীকে স্বীয় পৃষ্ঠোপরি ধারণ করেছিলেন। সেই অনন্তশয্যাশায়ী বসুদেবনন্দন নারায়ণ সকলের আনন্দ বর্ধন করুন।। ২।।
- (যাঁহার) উচ্চ দশনাগ্রে অবস্থিতা সপর্বতা পৃথিবী কেতকী কুসুমাগ্রে অবস্থিত ষট্‌পদের শোভা বিস্তার করেছিলেন, সেই বরাহ অবতার প্রভুমুরারি আমাদের শ্রী সম্পাদন করুন।। ৩।।
- আদি বৈরী (হিরণ্যকশিপু) আঘাতে বিভক্ত দারুস্তম্ভে স্বভক্ত প্রহ্লাদের অতিভক্তি বলে প্রকাশিত হ'য়ে যিনি লক্ষ্মীর ভীতিপ্রদ অভঙ্গুরাগ্র প্রখর নখাঘাতে বক্ষঃ বিদীর্ণ করেছিলেন সেই নৃসিংহ তোমাদের পাপ নষ্ট করুন।। ৪।।
- যিনি ত্রিলোক বিলয় স্থান নিজদেহ খর্ব ক'রে উপহার ছলে ত্রৈলোক্য গ্রহণ করে বলিরাজকে বন্ধন করেছিলেন, সেই বামন তোমাদের মন মোহমুক্ত করুন।। ৫।।
- যিনি সমগ্র পৃথিবীকে ব্রহ্মত্রা করেছিলেন, নিহত ক্ষত্রিয়দের রুধিরপান মত্ত পিশাচেরা যাঁর প্রতাপ কীর্তন করতো, সেই পরশুরাম তোমাদের চিত্তে বিহার করুন।। ৬।।
- যিনি নতশির সুগ্রীবকে সাম্রাজ্য সমর্পণ করেছিলেন, যিনি রাবণকুল সংহারে ধূমকেতু স্বরূপ ও হরধনু ভঙ্গকারী, সেই জানকীপতি শ্রীরাম আমার পাপরাশি বিনাশ করুন।। ৭।।
- যিনি গোপাল রূপে স্বীয় প্রতাপে গোবর্ধন-গিরি দ্বারা মেঘজাল বর্ষণে গোধন রক্ষা করেছিলেন, চক্রধর পৌণ্ড্রক বাসুদেবকে যিনি বধ করেন, সর্পাকৃতি অঘাসুরকে যিনি বিনষ্ট করেন, পদাঘাতে যিনি শকট ভঙ্গ করেন, সেই চক্রধারী আমাদের রক্ষা করুন।। ৮।।
- যিনি ভূতলে পদ্মাসনে বসে প্রাণ সংযম ও নাসাগ্রে দৃষ্টিস্থাপন করে উপবিষ্ট ছিলেন এবং যোগিবৃন্দের অগ্রগণ্য হয়ে কলিকালে প্রাদুর্ভূত হন, সেই বুদ্ধদেব আমাদের চিত্তে থাকুন।। ৯।।
- যিনি অশ্বারূঢ় হয়ে খড়্গাধারণপূর্বক দুর্বৃত্তপরিপূর্ণ সংসার সংহার করেন, দশরূপধারী মুরারি সেই শুদ্ধচরিত্র কল্কিরূপে তোমাদের ষড়্‌রিপু ক্ষয় করুন।। ১০।।

শ্রীজয়দেবকৃত দশাবতার স্তোত্র

প্রলয় পয়োধি জলে ধৃতবানসি বেদং , বিহিতবহিত্রচরিত্রমখেদম্।

কেশব ধৃত মীনশরীর, জয় জগদীশ হরে ।১।

ক্ষিতিরতিবিপুল তরে তব তিষ্ঠতি পৃষ্ঠে, ধরণিধারণকিণচক্র গরিষ্ঠে।

কেশব ধৃত কচ্ছপরূপ, জয় জগদীশ হরে।২।

বসতি দশন শিখরে ধরণী তব লগ্না, শশিনি কলঙ্ককলেব নিমগ্না।

কেশব ধৃত শূকররূপ, জয় জগদীশ হরে ।৩।

তব করকমলবরে নখমদ্ভুত শৃঙ্গং দলিতহিরণ্যকশিপুতনুভৃঙ্গম্।

কেশব ধৃত নরহরিরূপ, জয় জগদীশ হরে ।৪।

ছলয়সি বিক্রমেণ বলিমদ্ভুতবামন, পদনখনীরজনিত জন পাবন।

কেশব ধৃত বামনরূপ, জয়জগদীশ হরে।৫।

ক্ষত্রিয় রুধির ময়ে জগদপগত পাপং স্নপয়সি পয়সি শমিত ভবতাপম্।

কেশব ধৃতভৃগুপতিরূপ, জয় জগদীশ হরে।৬।

বিতরসি দিক্ষু রণে দিক্‌পতি কমনীয়ং দশমুখমৌলিবলিং রমণীয়ম্।

কেশব ধৃত রঘুপতিরূপ জয় জগদীশ হরে।৭।

বহসি বপুষি বিশদে বসনং জলদাভং হলহতিভীতিমিলিতযমুনাভম্।

কেশব ধৃত হলধররূপ, জয় জগদীশ হরে।৮।

নিন্দসি যজ্ঞবিধেরহহ শ্রুতিজাতং , সদয়হৃদয়দর্শিত পশুঘাতম্।

কেশব ধৃত বুদ্ধ শরীর জয় জগদীশ হরে ।৯।

ম্লেচ্ছনিবহনিধনে কলয়সি করবালং ধূমকেতুমিব কিমপি করালম্।

কেশব ধৃত কল্কিশরীর জয় জগদীশ হরে।১০।

শ্রীজয়দেব কবেরিদমুদিতমুদারং শৃণু সুখদং শুভদং ভবসারম্।

কেশব ধৃতদশবিধরূপ, জয় জগদীশ হরে।১১।।

অনুবাদ—

- যে বেদে তোমার চরিত্র ভবসাগরের তরণীরূপে উপদিষ্ট হয়েছে, সেই বেদকে তুমি প্রলয় জলমধ্যে ধারণ করেছিলে, হে কেশব, হে মৎস্যরূপী, জগদীশ্বর হে হরি তোমার জয় হোক। ১।
- পৃথিবী ধারণবশতঃ তোমার সুবিশাল পৃষ্ঠে দৃঢ় চক্রাকার যে চিহ্ন হয়েছে, তাতে পৃথিবী অবস্থান করে, হে কেশব কচ্ছপরূপী .... ।২।
- চন্দ্রে কলঙ্করেখা যেমন অবস্থিত, তোমার দন্তাগ্রে সংলগ্ন হয়ে পৃথিবীও তেমন অবস্থান করছে, হে কেশব , হে বরাহরূপী ...... ।৩।
- তোমার শ্রেষ্ঠ করকমলের সুতীক্ষ্ণ নখে হিরণ্যকশিপুর তনুরূপ ভ্রমর বিদলিত হয়, হে কেশব হে নৃশিংহরূপধারী ...... ।৪।
- হে অপূর্ব বামন, তোমার পদনখজলে ত্রিলোক পবিত্র হয় ; তুমি পদক্ষেপ দ্বারা বলিকে ছলনা কর; হে কেশব, হে বামনরূপধারী ...... ।৫।
- তুমি ক্ষত্রিয়ের রুধির রূপ জলে জগৎকে স্নান করিয়ে তার পাপ দূর কর, এবং জগতের তাপ শান্ত কর; হে কেশব, হে পরশুরামরূপী ..... ।৬।
- তুমি যুদ্ধে দশদিকপালের বাঞ্ছনীয় রাবণের মস্তকরূপ রমণীয় বলি দশদিকে বিতরণ কর; হে কেশব, হে রামরূপধারী ...... ।৭।
- তুমি বিশাল দেহে লাঙ্গলের আঘাতে সন্ত্রস্তা যমুনার আভায় রঞ্জিত নীলবর্ণ বস্ত্র ধারণ কর; হে কেশব, হে বলরামরূপী .... ।৮।
- হে কৃপাময়,যজ্ঞ প্রতিপাদক যে সকল বেদবাক্যে পশুহিংসা বিহিত হয়েছে তা তুমি নিন্দা কর; হে কেশব হে বুদ্ধরূপধারী ......।৯।
- ম্লেচ্ছসমূহের নিধনকালে তুমি ধূমকেতুসম ভয়ঙ্কর খড়্গ ধারণ কর, হে কেশব হে দশরূপধারী .....।১০।
- তুমি শ্রীজয়দেব কবি রচিত এই উদার সুখদ, শুভদ ও ভবসার স্তব শ্রবণ কর, হে কেশব, হে দশরূপধারী .....।১১।

পরিশিষ্ট

দশাবতারের কথা যে সকল গ্রন্থে কথিত হইয়াছে তাহার একটি তালিকা নির্মাণ করা হইল। ইহাতে সহজেই দশাবতার ও তাহাদের কাহিনীর উৎসমুখ জানা যাইবে। জিজ্ঞাসু পাঠক সহজে এই বিষয়ক বহু তথ্য সংগ্রহ করিতে পারিবেন।

অবতার	উৎস	
	পুরাণ গ্রন্থ	অন্যান্য গ্রন্থ
১। মৎস্য	মৎস্য, গরুড়, অগ্নি	মহাভারত
২। কূর্ম	কূর্ম, গরুড়, অগ্নি, বিষ্ণু	
৩। বরাহ	বরাহ, গরুড়, অগ্নি, কালিকা	মহাভারত
৪। নৃসিংহ	নৃসিংহ, নারসিংহ, বৃহন্নারসিংহ দেবী, গরুড়, অগ্নি, বিষ্ণু	
৫। বামন	বামন, দেবী, গরুড়, অগ্নি, মহাভাগবত	
৬। পরশুরাম	দেবী, অগ্নি, ব্রহ্মবৈবর্ত, গরুড় মহাভারত	রামায়ণ,
৭। শ্রীরাম	দেবী, গরুড়, অগ্নি	রামায়ণ
৮। শ্রীকৃষ্ণ	শ্রীমদ্ভাগবত, দেবী, গরুড়, অগ্নি, ব্রহ্মবৈবর্ত	মহাভারত, হরিবংশ
৯। বুদ্ধ	গরুড়	
১০। কল্কি	কল্কি, গরুড়	